খুকি তোর জন্যে

নিউ এজ পাবলিকেশন্স

KHUKI TOR JANYE

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৭১, দ্বিতীয় প্রকাশ : আগস্ট ২০০৩, গ্রন্থস্বত্ব : যাহেদ করিম, প্রচ্ছদ : সুখেন দাস, বিজয় রায় কর্তৃক নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ৬৫ প্যারী দাস রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং দিলীপ রায় কর্তৃক অনু প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২ জয় চন্দ্র ঘোষ লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

কবিতা পাগলী মেয়ে
শতাব্দী রায়কে

সূচিপত্র

কপাল ছুঁয়েছিল যে

আমার কপালের ওপরে সেদিন রেখেছিলি
ফাগুন নরম হাত।
আমার কপালের ওপরে দাঁড়িয়েছিল
গোটা ফাগুন মাস।

মাথার ভিজে অশান্ত চুল
ওড়না দিয়ে মুছিয়ে বলেছিলি
তোর মন-বৃন্দাবনে আমি নাকি
করেছি রাস উৎসব।

আজও সেই জোছ্না পাগল ফাগুনে
মাথার চুল যায় ভিজে
তবু কপালের ওপরে নেই কেন সেই
আকাশ জোড়া চাঁদ!

যে প্রেম ছুঁয়েছিল
সেদিনের পুলকিত রাত
সে প্রেম এখন তবে
কোন্ বাদলের দাস?

আজ না হয়

আজ না হয় অফিস বন্ধ কর।
রোজ রোজ বৈশাখী ঝড় ভালো লাগে?
বরং চল পুরনো একঘেয়েমীগুলো ঝেড়ে
আমার পাখা মেলি
উড়াল পঙ্খির সঙ্গে।

চল আমরা সঙ্গী করি
হল্‌দে সরষে ফুল
দুর্বার প্রেমে জড়ান অনন্ত মেঠো পথ।

জলপদ্ম শাড়িতে ভিজে
চল ফাগুনের হাওয়ায় গা শুকায়।

কোন কসমেটিক নয়,
তুমি আমার বেনুনিতে গুজে দিও সরল অন্ধকার
আর চোখের পাতায় দু'টো নীল অপরাজিতা।
পারলে হাতে পড়িয়ে দিও
ভাঁটুই ফুলের মালা।

তারপর আকাশের কপালে চাঁদের টিপ উঠলে
না হয় আবার ফিরব কলেজস্ট্রীটে।

রদবদল

বেহুলা নামের মেয়েটির সঙ্গে দেখা হল।
কাহারপাড়ায় বাড়ি।
প্রায় একযুগ বাদে দেখা—
রজনীগন্ধার মত সেই সুগন্ধ হাসি
ডালিমের মত বর্ণময় মুখ
কালের অন্তরালে এখন।
তবে এখনও সেই চকিত চাহনি।

ওর মুখে শুনলাম
গত বছর ধানের জমি বাঁচানোর লড়ায়ে
ওর স্বামী প্রাণ হারিয়েছিল।
মৃত স্বামীকে নিয়ে পুলিশ-প্রশাসনের সামনে
দীর্ঘ প্রতীক্ষা।
তারপর কতবার প্রতীক্ষিত দিন এমনকি রাতও!

এভাবে একসময় ঢলে পড়ে সকালের সূর্য
ক্ষয় হয়ে আসে বুড়ি চাঁদের গৌরব।
বেহুলার দিন-মাস-বছর সুবিচারের অপেক্ষায় থেকে
ফিরে আসে।
পদ্মাপুরাণের বেহুলা দেবসমাজ থেকে ফিরিয়ে আনে
তার বাসরঘরে হারান লখীন্দরকে।
কাহারপাড়ার এই বেহুলা পুলিশ-প্রশাসন থেকে
তার গর্ভে কুড়িয়ে আনে কালের দুঃশাসনকে।

ভঙ্গুর হৃদয়-কথা

কাঁচের মত ভঙ্গুর আমার হৃদয়
একটুকরো ঢিলের আঘাতেই
ভেঙে খানখান।

পাখির পালকের মত পেলব আমার দেহ।
নীল পাহাড়ের চূড়োর উঠবো কেমন করে বল।
তুমি তো বলিষ্ঠ সবল দেহাতি পাহাড়
আমার শাখায় মাথা না রেখে
লক্ষ্মীটি, তোমার বুকে আমার ক্লান্ত মাথাটা রাখতে দাও।

মন ও কুয়াশা

ফ্রকের নীচে কুয়াশা ভরা মন
চুপ্‌টি করে কাঁদতে থাকে।
ভাঙচুর হয় গত কাল-পরশু এমনকি আগামীর স্বপ্নও।
ভাসান গানে লখীন্দরের মৃত্যুতে
বেহুলার কান্না ভেসে আসে কানে।

মেয়েটি ফ্রক খোলে।
মনটাকে দু'হাত বুলিয়ে দেখে
মন থেকে কোথায় হারিয়ে গেছে
দুষ্টু সেই মন।

ঠিকানা

মাস্টারমশাই আমি ডিগ্রী চাই না।
ছোটবেলা মা তার মাস্টারমশাইদের গল্প শোনাতেন।
ত্যাগী দধীচিদের অবশেষ কঙ্কালদানে
কত বৃত্রাসুব মানুষ হত।
মার মুখে তাদের কথা শুনে
শ্রদ্ধায় কুঁড়িগুলো সকালের বাগিচায়
ফুলে ফুলে ভরে যেত।
আর সেকি আনন্দ হত আমার।
সেই হাঁটুর ওপরে ধুতি,
মোটা ফ্রেমেব চশমা
ফিতে ছেঁড়া চপ্পল
চোখে ভাসতেই
আমি অন্য আমি।

সেই শ্রদ্ধাতেই করিডোরেব পথ ধবে
আপনাব একান্ত আপন ঘরটিতে পৌঁছলাম।
মায়ের মত আমিও প্রণাম করলাম
দু'খানি হাত পায়ে বেখে।
আর আপনি হাত দু'খানি হাতে চেপে
আপনার পাহাড়-পর্বতেব গিরিপথে
আমায় ঠেলে দিলেন!

মাগো অন্ধকার
গভীর অন্ধকার
এ মাস্টার নয়, তোমাব মাস্টারমশাইকে ডাকো
আমি জানব আমা: মাস্টারমশাই কি
তোমার মাস্টারমশাইয়ের ছাত্র ছিল!

প্রত্যাখ্যানের গান

আজও ভাঙা সাইকেলের প্যাটেলে জোর পা—
চাকা ঘুরছে তো ঘুরছে—
পৃথিবীর চাকা।

পথেরও একসময় শেষ হয়
যদিও পৃথিবীটা গোল।
অবশ্য কারও কাছে সোজা
জ্যামিতির পাঁচ কি দশ সেন্টিমিটার
সরল রেখার মত।

সাইকেল রেখে হাঁটা
হাঁটা রেখে দৌড়ান
ক্লান্তি, বসা ; কিন্তু কোমর ভেঙে বসা নয়।
আমাদের ঋজুপাঠের মত
ঋজু থাকতে হয়।

ব্যথায় কাঁদতে নেই
আনন্দে হাসতে নেই
ইচ্ছে থাকলেও চাইতে নেই
চাইলেও পেতে নেই।

উপরের বাড়ির লনে চোখ রাখতে নেই।
ওখানে সুস্মিতা দাঁড়িয়ে—
পশুর মত অর্ধ হিউম্যানকে দ্যাখে
ভালো লাগলে বাড়ির নোংরা পরিষ্কারের জন্যে ডাকে
অন্যথায় থুথু।

আমাদের সব সময় সোজা পথে চলতে নেই
বাঁকা পথে আমাদের অলিখিত গতি
পৃথিবীর গতির সঙ্গে তাল মিলিযে দৌড়ান।
কখনও ভাঙা সাইকেলে, কখনও খালি পায়ে
কিন্তু গতির পুরস্কার চাইতে নেই
ওগুলো গতিহীন বিলাসী বাবুদের।

নষ্ট স্বপ্ন, নগ্ন প্রেম

পৌলমী, আজ অন্তত নগ্নমূর্তিতে দাঁড়িও না।
নগ্নমূর্তি দেখতে দেখতে আমি ক্লান্ত।

ছোট থেকে দেখেছি বাবা-মার নিজস্ব সীমান্ত রক্ষার দূরত্ব।
সন্ধ্যা না হতেই মদের চিনে-জোঁক আড্ডা।
দমবন্ধ করা সাদা অভিমানী ধোঁওয়া।

দেখেছি বাবার মুখের সামনে
মায়ের সজোর দরজা বন্ধ করতে।

বড় হতেই দেখেছি বাবা-মার ডিভোর্স।
বাবা শান্তা কাকিমার সঙ্গে
আলিপুর ফ্লাটে
আর মা বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রীটে
শোভনকাকুর সঙ্গে ফূর্তিতে।
আমি সেই থেকে একা হোস্টেলে।

মাস গেলে শুধু টাকা আসে
কখনও শান্তা কাকিমা
কোনদিন শোভনকাকু টাকা ছুড়ে দেয়
টাকা নয়, ওরা কামনার আগুন ছুড়ে দেয়।
আর দু'জনেই মলাটহীন চেষ্টায় বোঝাতে থাকে
ওরা আমার কত মঙ্গল চায়।

আমি বেশ বুঝি
যারা সত্যি আমার ইচ্ছের বাগান
ফুলে ফলে ভরিয়ে দিতে পারত
তারা দু'পুরের শাণিত রোদ্দুর গায়ে মেখে
আমার জন্যে রেখেছে শুধু বিষাদ প্লাবিত বৈকাল।

পৌলমী, তুমি অন্তত
শান্তি দাও।
ভালোবাসাহীন মানুষ, নষ্ট স্বপ্ন, নগ্ন প্রেম
শুকনো কর্তব্য, জারজ বিবেক দেখে আমি ক্লান্ত।

আজ রাতে তোমার দেহের বেশ খুলে
আমাকে নগ্নমূর্তি দেখিও না।
বরং পৃথিবী ভাসান স্নিগ্ধ এই জোৎস্নায়
পাখির শেষ উড়াল যাত্রা দেখতে দাও।

খেয়ালি রাত

আজ রাতে তোমার সঙ্গে
আদিম জ্ঞানবৃক্ষের রাত কাটাব না।
ঈভ-আদমের বেপরোয়া রাত কাটাব না।
ভাসব না ময়ূরপঙ্খী ভেলায়।
স্বাস্থ্যবান গাছ হয়ে
পরগাছা প্রেমে ভাসব না।

কালরাতে পায়রা দুটো সারারাত
ইচ্ছে-ডানায় দৌড়ে
বক-বকম্ বক-বকম্ গেয়েছে।
আজ আবার কেন?
আজ ওদের খাঁচা থেকে উড়তে দাও।

সমুদ্র হাতড়াতে হাতড়াতে
ধূ ধূ বালি উঠলে তোমার কি ভাল লাগবে।
তার থেকে ঢের ভাল
চল নীল আঁচলে আকাশ ধরি।

অদেখা প্রেম

আজও বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে
        গিয়েছিলাম তোমাদের বাড়িতে।
            মাসিমা বললেন, তুমি বেরিয়েছ
                আমি ফিরে এলাম।

কলেজ স্ট্রীটের বইপাড়া
            এখন আমার বাসর-ঘরের মত
                সলজ্জ চেনা।
সোজা সটান হাঁটার সময়
            শুনতে পেলাম
                যাচ্ছে দেখ, যেন বৃষ্টিভেজা কাকাতুয়া।
বুঝলাম বইপাড়ার কাকু-জেঠুরাও
            আমাকে নিয়ে সস্তা হিসেবী অর্থ গোনে।
                আভাসে-ইঙ্গিতে শুধু নষ্ট চোখ।

বাড়ি ফিরে আকাশ-গুমোট মন
        আর হাল্‌কা বজ্রপাতের মত খুশ খুশ কাশি
            মা পাঠালেন ডাক্তারের কাছে।
ফিরে এসে শুনলাম
        তুমি এসেছিলে
            আমি দৌড়ে গেলাম ছাদে
দেখলাম দুধ-সাদা সন্ধ্যা তারা
        আমায় খুঁজছে—
            আমি কেঁদে ফেললাম।

নীরবতাই কখনও বা

বারো বছরের নিঃশেষিত মেয়েটি দু'দিন বিবশ থেকে
অবশেষে তাকাল।
ভয়ে, সংশয়ে আর অতল বিস্ময়ে
মুখের চড়ুই কথা তার
বাতাসে গিয়েছে মিলিয়ে।
তাই আজ অদ্ভুত রুক্ষ্ম চোখের বিবর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে।

বাবা, মা, আত্মীয়
এমনকি বন্ধুর দল
কত বোঝাচ্ছিল তাকে
কিন্তু তবুও সেই করুণা-ছায়া ঘেরা
নির্জীব সেই দৃষ্টি।

পরশু রাতে তার মুখে লাল রুমাল গুঁজে
পদ্মের নাল ভাঙার মত
ঝোড়ো সর্বনাশ নিয়ে মেয়েটিকে যে ধ্বস্ত করেছে
সেই দুঃশাসন জামাইবাবুর দৈত্যকায় ছবিটা
এখনও তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

দিদির কাছে তার নারীত্ব হননের কথা
কি ভাষায় জানাবে তা সে জানে না!
তাই অস্বাভাবিক বোবা একটা জমাট নীরবতা তার মুখ জুড়ে
ভয় দেখায়।
তাই সে পাথরের মত গভীর নীরব।

নীরবতাই কখনও বা
জীবনের শেষ কথা হয়ে যায়
ভয়ে, নৈরাশ্যে, অবিশ্বাস্য পদক্ষেপে।

তখনও তোমায় ছুঁয়ে

আমার কঙ্কাল হাতে
যখন তুমি শরীরতত্ত্বের
শেষ পরীক্ষাটা করবে—
তখনও আমি গভীর অনুভবে
তোমায় ছুঁয়ে থাকব।

আমার অস্থিসার মস্তিষ্ক থেকে
তুমি শুনতে পাবে
একক-দশক-শতকের কত গড়মিল অঙ্ককে।
জীবনের ভুলে ভরা অঙ্কগুলো
সেই শুষ্ক কাঠের মত মস্তিষ্কে
আজও গোপন বাসা বেঁধে
তোমাকে খোঁজে।

আর বুকের পাঁজরের ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দে
তুমি যদি কান রাখ
তবে সেখানে স্মৃতি মেদুর
প্রিয় বিচ্ছেদের সোনালি বালুতট পাবে।

খেদ—'তবু শিল্পের প্রাঙ্গণে'

প্রকাশের নিরন্তর যাতনা
অঙ্কুরোদ্‌গমের মত আমার
মনে-প্রাণে রক্তক্ষরণ ঘটায়।
তবুও
কল্পনার মায়াঞ্জন দু'চোখে এঁকে
লেখা হয় না একটিও মরমী কবিতা।
মাঘী পূর্ণিমার পড়ন্ত বেলায়
নির্নিমেষ চেয়ে দিগন্তের জলছবি পানে
তবুও মুক্তঝরা অশ্রু শিশিরের শব্দে
কবিতা হয়ে ঝরে পড়ে না খাতার কালিহীন নির্মেদ পৃষ্ঠাতে।
শিল্পের
বিস্তীর্ণ উর্বর শস্যপ্রান্তরে
কত ফসল কৃষকের মনে বৈশাখী ধানেব মেদুরতা আনে।
প্রাঙ্গণে
একাকী আনমনে দাঁড়িয়ে দুর্ভিক্ষের দেশেব মত
শিল্প-সাহিত্যে অনাহারী আমি।

অনুচিন্তা

তুমি বলেছিলে
সমুদ্রের ফেনা দিয়ে
আমার শার্ট বানাবে।

আর নীল আকাশ ধরে
আমার চশমা।

সেই থেকে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে ভেবেছি
মেঘ হল আমার খেলনা।

সম্পর্ক

ব্যস্ত মানুষ
    বকাটে পাগল
        নিশ্চুপ দার্শনিক।

ব্যস্ত যান
        বকাটে বিবেক
            নিশ্চুপ সমুদ্র।

মরা চাঁদ
    শান্ত দ্বীপ
        হেঁয়ালি রাত।

মরা মানবতা
    শান্ত মনুষ্যত্ব
        হেঁয়ালি মূল্যবোধ।

আত্মনাশী

ফণিমনসা মনে
পরগাছা সাপ গভীর প্রেমে
চুম্বন...আলিঙ্গণ...রতিমিলনে।
তারপর শিথিল নিদ্রা।

পথচলতি বেহিসাবি ব্যাঙের নৃত্য জমে ওঠে
উইপোকার দেহ-লুণ্ঠনের রসে।
খাদ্য সঞ্চয়ে ব্যাঙের নাভিদেশ হয় ভারী
আড়চোখে নাগিন সাপ দ্যাখে।
ব্যাঙের তারস্বর চীৎকারে রতি-মিলন আহ্বান
পেশাদারী লোলুপ নাগিনের জিহ্বায় লালা আনে।

ব্যাঙের মুখে চুম্বনের পর চুম্বন।
    বাঈজী ঘুঙুর পরা ব্যাঙের তোষামুদী ব্যভিচার
    নাগিনের ধৈর্যের বাধ ভাঙে।
    তারপর ফণিমনসার অন্ধকার ঝোঁপ কাঁপতে থাকে।
        অবশেষে সব স্তব্ধ।
        বাতাস বন্ধ।
            চারিদিক গরম গুমোট।

একপেট খাদ্যে ভরপুর নাগিন।
খাদ্য কখনও বাঈজী ব্যাঙ্।
    কখনও বা সবে এই তের-চৌদ্দ ছুঁই ছুঁই
ফণিমনসার পাশ দিয়ে হাঁটা নাবালিকা।

একসময় অভ্যাসের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে
    নাগিন রতিক্রিয়ায় অন্ধ।
    রতি-আস্বাদে কখনও নাগিনী
    কখনও পড়শী মেয়ে
    অবশেষে আত্মজকে!

তুমি আসবে বলে

তুমি আসবে বলে
ঘুম চোখে পথ হেঁটেছি
পুকুর পারে রানির সঙ্গে
গল্প ফেলে দৌড়েছি।

তুমি আসবে বলে
ঠাকুরনগর থেকে আনিয়েছি
টকটকে লাল গোলাপ
আর শিশির ভেজা শরৎ।

তুমি আসবে বলে
দেহের বাঁধন দিয়েছি খুলে
চুলে গুঁজেছি পূর্ণিমার চাঁদ
মনে বসিয়েছি গোটা আকাশ।

তুমি আসবে বলে
বৃষ্টিকে পাঠিয়েছি রৌদ্রের শাসনে
রাস্তায় বিছিয়েছি দূর্বার চাদর
ঊর্ণা সরিয়েছি বুকের ওপর থেকে।

তুমি আসবে বলে
সন্ধ্যার বিদ্যুৎ করেছি চুরি
অন্ধকারের মধ্যে কত হাতড়েছি
কিন্তু তোমায় পেলাম কই!

আগন্তুক পুরুষ

১.

হিম-মনে কাঁপছে শরীর,
জাগছে সবুজ রঙ।
রাতের শেষে কোকিলের ডাক,
এসেছে ফাগুন মাস।

২.

খুলে দাও দেহের লজ্জা-আভরণ
উলটে পালটে নাও অদৃশ্য রাত
নক্ষত্রকে আলো ছুঁড়তে কর বারণ।

দূরে ঝাপ্‌সা অন্ধকারে
চোরা গর্ত থেকে যদি বেরিয়ে আসে অন্য রাতের স্মৃতি
আগন্তুক পুরুষকে তবু ফিরাবে না এই পূর্ণিমাতে।

৩.

আবার এসেছ? এতদিন কাটিয়ে?
নদীতে বেশ তো ছিল ভাটা, আবার কেন বান ডাকালে?

এক থেকে চার

আমাদের বহু প্রতীক্ষিত
প্রথম চুম্বনে
সমুদ্রের আহ্লাদী ফেনপুঞ্জ
এক দৌড়ে
জাপ্‌টে ধরে ক্ষুধার্ত সৈকতকে।

দ্বিতীয় চুম্বনে
ইঁটের লোভের শিকার মৃত হলদে ঘাস
সটান দাঁড়ায় দু'পায়ে।
চোখে তার সবুজ বিপ্লব
বুকে মুক্ত ভারতের সতেজ স্বপ্ন।

তৃতীয় চুম্বনে
বিশ্বের উচ্ছিষ্ট অপচয়ী মূল্যবোধের ডাস্টবিনে
পরিত্যক্ত অমানবিক বাপ্‌-মায়ের
অন্ধকার রাতের অবৈধ সন্তান
হামাগুড়ি দিয়ে নীড়হারা আম্মার কোলে
নিরাপদ আশ্রয়।

চতুর্থ চুম্বনে
রক্তকরবীর রঞ্জন বেঁচে ওঠে নন্দিনীর প্রেমের টানে।
নন্দিনীর বুকে মাথা রাখতেই
যক্ষরাজের মনে বৃষ্টি নামে।

অতিক্রান্ত যৌবন

ধুলোয় গড়াগড়ি খায় শবরীর প্রেম।
গুঞ্জা ফুলের খোঁপা বাঁধা অন্ত্যজ নারী
পাহাড়ি পথে হাড়িয়া কাঁখে
জলরাশি মাথা দোলায় উন্মাদ হাওয়ার তরঙ্গে।

মেঘ-কালো, কেশ-কালো, কালো কৃষ্ণের রঙ
তার অধিক নিকষ কালো শবরীর দেহের গঠন।
উত্তর তিরিশ প্রগলভ প্রাণে দোলে ময়ূরের পালক
শবরীর কথা দোলায় নড়বড়ে চিত্তলোক।

অনুপ্রেরণা

আজ এ কবিতার প্রতিটি শব্দ
তোমাকে জড়িয়ে—
গভীর স্মৃতিমেদুর প্রেমে
হিম-অতীতের কথা শোনায়।

সুচিহ্নিত সকাল
একরাশ ঘন দুপুর
দীঘল সন্ধ্যা
রতিঝরা মেদুর উচ্ছন্ন রাত
কোনটাই তোমার উদ্দেশ্যে নয়।

তুমি চিহ্নিত বর্ণমালার
সমুদয় বৃত্ত ছেড়ে
আর এক স্বতন্ত্র বৃত্ত।

আমার হিরণ্য মনে
জমে থাকা বেকারী দুর্বলতা
তোমার মেঘ-নরম জোৎস্না দিয়ে
ধুয়ে দিয়েছ।

নির্দিষ্ট কোন দিন-রাত
কিংবা শরৎ, আকাশ, চাঁদ, চুমু
এমনকি নপুংস প্রেম—
হিংস্র শরীরী হানা—
এর কোনটা দিয়ে

তোমার অফুরান প্রেমকে
দৃষ্টিনন্দিত বলে দেখান যায় না।

কবির চিরবিস্ময়ের
প্রতিটি কল্পলোকের
জমাট বাঁধা গাঢ় সত্তার
গভীরে তোমারি
জলছবির উপস্থিতি।
কখনও কাঁদ নীরবে, কখনও আবার বসন্তের শেষ রাগিণীর সুরে
বিরহ-আগুন দু'পাটি দাঁতে চেপে
শেষ হাসিটা হাসো।

গভীর বাণীর তলদেশ ছুঁয়ে
অধরা প্রাণের সন্ধানে
কখনও বা বর্ষার পেটে
শিলাবৃষ্টির ধারা-পতন শোন।

যে জীবন কখনও চাষী. জেলে
শ্রমিকের মাল বওয়ার থেকে
আরও কিছু স্বপ্ন গরল হিসেবের
সেই জীবনে তুমি সমুদ্র মন্থন করে
ভবিষ্যতের অমৃত তোলো।

শিল্পীর কল্প তুলি
তোমারি রঙে
সৃষ্টির ভুবন নির্মাণ করে।
যাতনার সুতো ক্রম বিস্তারে
জীবনের রঙ্ ধরে।

সংসারের ঝড়ে যতবারই
মনের ডাল-পালা
তুলোর মত দিগভ্রান্ত ঘুরেছে—
তখনি বন্ধু সান্ত্বনার সুরে
আমারি পাশে থেকে
কবিতার ছন্দে জীবনের ঘূর্ণি থামিয়ে
স্মৃতি-মেদুর সেদিনের স্বপ্নে ভরিয়েছ।

খুকি তোর জন্যে

খুকি অবশেষে তোর চিঠি পেলাম।
একটা কথা বলব, রাগ করবি না তো?
মাঝে-মধ্যে মনে হয়, তুই কাছে থাকলে—
না থাক।

আর দেখতে চাই না সুপক্ক রসাল সর্বনাশ।
পথে কত ফুল দেখি
হাত দিতে ভয় হয়
পাছে তুই যদি কষ্ট পাস।

যে মন পেয়েছে তোর আকাশ
দেখেছে সরবরের মাঝে ভেসে থাকা মানস পদ্ম
আর তৃষ্ণাভরা শরীরের নরম গন্ধ
সে কি পারে পালক খসিয়ে দেখতে।

কত রাত স্বপনে
সমুদ্রের ফেনপুঞ্জে, রাতের নক্ষত্র দীপে, অরণ্যের সূক্ষ্ম রোমে
মিশেছি তোর সঙ্গে—
আদি অন্তব্যাপী অনিঃশেষ প্রেমের
শান্ত সুশীতল মলয়ে কণ্ঠ ভাসিয়ে
সুর ভেজেছি
খুকি তোর জন্যে।

সৃজার কাছে দেওয়া চিঠির এক কোণে লিখেছিস
'বুবুন কেমন আছে রে?
ভাল তো
খুব কষ্ট হয়।'
আমারও।
হিতৈষীদের জিজ্ঞাসায় শুধু বলতে হয়
ভালো আছি।

কিন্তু সত্যি কি আমি ভালো আছি?
সেদিনের দার্জিলিং ছোট্ট শহর
মিরিকের মেঘ
এখনও আমাকে ভেজায়
তবে জানালা নয়,
বালিশ।

খুকিরে 'অতীত' নামের জলীয়বাষ্প
স্মৃতি-আকাশ জুড়ে ঘনীভূত হয়।
তারপর একসময়
দামিনীর ঝটিকা নৃত্যে ভাঙতে চায়
মনের ঘুণ ধরা দরজা-
জানালা।

ইচ্ছাশক্তি বিষণ্ণতার ভর দুপুরে ডুবেছে
তাই
দেহযন্ত্র সামান্য ছোঁয়াতেই লজ্জাবতির মত
পড়ে নুইয়ে।

বিষাদের গ্রাসে ক্লান্তি ও গ্লানি ভরে
করেছি পান
অমাবস্যার শেষ চাঁদ পাব বলে।
দহন-যাতনার চিতায় দেহশুদ্ধ ভস্ম করেও
তবুও ভাল আছি।
জানি বনের সব পাখি আলোর ইশারাতে
মুছে ফেলবে রাতের সব ক্লান্তি।

ইচ্ছে-বৃষ্টি

রাতের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে
সুস্পষ্ট করুণ শব্দযুগে
আমার ঘুম নেয় কেড়ে।
শীতার্ত হিমভর্তি নিশীথে
রতি-বাসে সাগর উপচে গেলে
সৈকতের কপাল জুড়ে পড়ে থাকে
শেষ আদরের ঘাম।

তখনও অদৃশ্য মায়া আমার দুচোখে
হাতড়াতে থাকে।
আজ এ রাতে অঝোর বৃষ্টি ডালিমের পাতা ছিঁড়ে
সশব্দে শিকড়ের তল ছুঁইয়ে আরও গভীরে
অথচ তুমি এই মুহূর্তে নেই কাছে।

বৃষ্টি পতনের গভীর এই গীতধ্বনিতে
তোমাকে মায়াবী শব্দবন্ধনে ঘুম ভাঙিয়ে
অভ্যাসের ভীড়ে যুদ্ধ পোশাক পরিয়ে
দিতাম না শরীরে রক্ত ঝরাতে।

শুধু কৃষ্ণ মেঘের আঁচল নিঙড়ে
জল বার করে
তোমার দুষ্টু মনটাকে দিতাম ভিজিয়ে
ঘুমচোখে পাশে হাত দিতে গিয়ে দেখি বিছানা খালি
এমন রাতে তোমাকে ছেড়ে বৃষ্টিকে কি করে
ভালবাসি।

ফেরারী প্রেম

নীল সমুদ্র আর নীলাকাশের
গভীর আলিঙ্গণের মত
আমাদের এ প্রেম।

হাল্কা ঢেউয়ের মাথায় উঠে
শঙ্খ যেমন আবার ফিরে যায়
সুবিস্তারী সমুদ্রের সংসারে
তেমন ফেরার
আমাদের এ প্রেম।

সীমানা দখল

শোননা
আজ রাতে
খোকাকে মাঝখানে রেখো না।
মাইরি বলছি—
দু'সীমানা এক করলেও
গুলিগোলা ছুঁড়ব না।

তাছাড়া
তুমি এমন
অযথা আমায় সন্দেহ কর কেন
আমি কি লুঠেরা
পাওয়া মাত্রই লুঠ!

শুধু
জান্‌লা গলে
পালিয়ে আসা দুষ্টু চাঁদটা
দু'জনের মাঝে বসুক।

তারপর
না হয়
খোকা ওঠার আগেই
পুনশ্চ সীমান্ত আসুক।

লক্ষ্মীটি
এখন শুধু
সীমানা উঠুক।
তারপর চাঁদ ঘরে ফিরলে
রবির কিরণে দু'জনের মাঝে
খোকার ঘুম ভাঙুক।

ইচ্ছে ডানায় ভাসা

খুকি, তোর মনে পড়ে
প্রথম যেদিন তোদের বাড়িতে
গিয়েছিলাম চৈত্রের দুপুরে।
সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কের বিন্যাসে
নিতান্ত ছাপোষা এই ছেলেটাকে
অতি যত্নে জায়গা দিয়েছিলে রৌদ্রে ভেজা মনেব বারান্দাতে।

অজান্তিক আঁধারের সুব্যাপ্ত মনে গুপ্ত হানা দিয়ে
আমরা চেয়েছিলাম রৌদ্রকরোজ্জ্বল সকালকে ছিনিয়ে আনতে।
রিপুতাড়িত মনের ভীড় ঠেলে
মনসার ভাসান, কীর্তন, মঙ্গল চণ্ডীর ব্রতে
আমাদের ছেলেবেলা দিয়েছি কাটিয়ে।
স্কুল পথে অর্ধেক ছাতার আড়ালে—
ভিজতে ভিজতে,
সাপের শঙ্খলাগা দেখে
রুমাল দিয়েছি ছুঁড়ে।

সবুজ ঘাসের বুকে জমে থাকা শিশির দু'পায়ে মেখে.
অনেক হেঁটেছি অনুদার শীতকে পেছনে ফেলে।
কথোপকথনের দৈন্য অস্পষ্টতা থেকে
মুক্তি পেতে দু'চোখের সীমান্ত দিয়েছি খুলে।
সবুজ লবঙ্গের অপূর্ব ক্ষুদে নীলচে ফুল কুড়িয়ে
দিয়েছি কাপাস তুলোর মত তোর নরম হাতে।

মেহগিনি গাছের তলে—
সন্ধে নীচু হয়ে আমার কোমর পর্যন্ত নেমে এলে
ঠাঁই দাঁড়িয়ে তখনও সেভাবে
তোর প্রতীক্ষাতে।

সন্ধ্যা তারার গা ঘেষে
রক্তিম এক নক্ষত্র ছন্নছাড়া জীবনের স্বাদে
খসে পড়ে মহাশূন্যের অন্ধকারে।

অনেক ক্লিন্ন রজনী মুখে রুমাল বেধে
ইশারাতে কথা বলে গ্যাছে।
যেমন অপুষ্ট-মালকিন কন্যা অজান্তিক ভাব জমায় চাকরের সঙ্গে।
প্রাচীন শব্দের ফলায় অপক্ক মন ঘঁষে
দু'কলম চিঠি মনিব-কন্যাকে দিয়েছে সে লিখে।

সে সময় শরীর মনের কোন তৃষ্ণাতে—
আমায় কাছে না ডেকে,
তোর শান্ত প্রেমের নিঃস্বার্থ দানে
আমাকে পূর্ণ করার অক্লান্ত প্রয়াসে
কত স্রোতের ধাক্কা সয়েছিস নীরবে।

আমারি ভবিষ্যতের মাটি শক্ত করতে
ক্লান্ত ঘর্মে, মেদুর স্বপ্নে, নিষ্ঠ সাধনাতে
রাতকে ডাকপিয়নে পাঠিয়েছিস দিনের ঠিকানাতে।
বন্ধুদের কত সমুদ্র ক্ষোভ আর মাতাল ঢেউকে
অপযুক্তির ফেনা বলে দিয়েছিস দূরে ঠেলে।

আমাকে জীবনের বিরামহীন অলিম্পিক দৌড়ে
অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিজয়ী রূপে দেখতে—
ফিরিয়েছিস বোটের দোলানি আর
ডলফিনের কোমড়-ভাঙা নৃত্যকে।
সুদীর্ঘ কর্মব্যস্ততার মধ্যে আমাকে স্বল্প বাক্যব্যয়ে লিখে
চেয়েছিস অনির্বাণ আলোর মত উজ্জ্বল দেখতে।
আমার মনের স্বচ্ছ জলরাশিতে একসময় ভেসে ওঠে—
নানা রঙের ঝিনুক, শঙ্খ, কোরালের ঐশ্বর্য।
তোর সোনালি বালুরাশির মধ্যে সেগুলি রাখলি লুকিয়ে।

নারকেল বীথি, সুঠাম সুন্দরী, শিরীষ পান্না দিয়ে
আমার মনের অনাবাদী দ্বীপে
জঙ্গল বাধালে—
তুই চাসনি ইচ্ছে ডানায় ভেসে
জঙ্গল সাফ্ করে
দুটি মনের একটি সমর্থ বাসা বাঁধতে।

কতবার চেয়েছিস সামুদ্রিক রঙ্-বাহারি মাছের দলে
আমার মনের অ্যাকোরিয়ামকে দিবি ভরিয়ে।
কিন্তু বিকালের পড়ন্ত আলোর মত অতি দ্রুত সম্পর্কের দীপ নিভে গেলে
গিয়েছিস আমাকে এড়িয়ে।
দিনের স্মৃতিটাকে ছবির মত মনের স্ক্রীনে ফেলে
কেঁদেছিস এই ভয়ে—
পাছে তুই স্বার্থপর হয়ে উঠিস আমার কাছে।

আবহকালের মন

শোন, আমি মিথ্যে বলছি না
প্রথম রাতে ভীষণ বৃষ্টি।
মাঝ-রাতে সেকি কাঁদা
তাই শেষ রাতে স্বামীর বিছানা ছেড়ে
তোমার জন্যে হাঁটা।

ঊষার আল্‌তো আঁধারি চুলে
তখনও হিম-বৃষ্টির জল
অপুষ্টি ব্যাঙের ডাক
মৃত্তিকার পৃষ্ঠদেশে
দুধ-বুকে ধান।

উচ্ছিষ্ট দেহ নিয়ে
তবুও তোমার জন্যে হেঁটেছি।
উদ্বাস্তু মন আগে থেকেই
স্বামীর দেহ অধিকারের আগেই—
তোমার দেশে পাড়ি দিয়েছিল।
তুমি বুঝতে পারনি।

জানলার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারা বৃষ্টির রেণু
তোমার বুকের ঘুমন্ত ঘাসে চুমু দিয়ে পালিয়েছিল।
আমি গিয়ে শুধুমাত্র
তোমার গায়ে ইচ্ছের কম্বলটা চাপিয়েছি।
তারপর তুমি পাশ ফেরার আগেই
ইচ্ছার বৃন্তে দাঁড়ান মৃণালটা রেখে
গাঢ় অভিযোগে পালিয়েছি।

আরেকটু থাকলে ভাল হত,
শোন, আমি মিথ্যে বলছি না
প্রথম বাত স্বামী-বৃষ্টির অধিকারে
মাঝরাতে আমি না চাইলেও
রাস্তায় স্যাঁতসেতে কাঁদা

তাই শেষ রাতে বৃষ্টিভোগী স্বামী ক্লান্তির বালিশে
ঘর্ম-সিক্ত মাথা রাখতেই
তোমার জন্যে হাঁটা।

জানি এভাবে দেহ ভেঙে
সন্তান।
একসময় নিভৃত মরণ।
চিতায় পুড়বে পাপী দেহ
স্বামী কাঁদবে নরম বৃষ্টির জন্যে।
তুমি কিন্তু এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলবে না
তুমি তো দেহ চাও না,
চাও শুভ্র-সকাল মন।
চিতায় দেহ দগ্ধ, চিন্তায় দগ্ধ হয় মন।
মন কখনও দগ্ধ হয়, সে তো তোমার।
আবহকালের মন।

নিষ্কলঙ্ক দান

শুনে তো অবাক।
দেবকন্যাকে ছুঁতে নেই।
সপ্তর্ষি প্রেম আকাশ-জুড়ে
তবুও দেখতে নেই।

মাঘের হিমানী।
কাঁথার মধ্যে যৌবনকে পুরে
শীত-কাতরেও বশে আনতে ব্যর্থ হয়।
তবুও বলা চায় এ মেয়ে যে ভৈরবী।

ফাগুনের পনেরো তারিখে।
অদৃশ্য দৈবী ইচ্ছেতে
বিয়ে হ'ল দেবকন্যার
তবুও বিশ্বাস, এ নাকি কপালের লিখন।

বেশ কয়েক মাস অসতর্ক রাত
রৌদ্রের বীর্যে অকাল গর্ভবতী ধান।
ঘনিষ্ঠ হবার রাত 'লীলা' বলা চায়
সহবাসে সতীচ্ছেদ হয়নি এখনও আজ।

দেবকন্যার গর্ভে উদ্বৃত্ত সন্তান
বাপের বাড়িতে অন্য ভক্তের আলিঙ্গন,
সারারাত ডুবুডুবু চাঁদ—
তবুও এ রাত নিষ্কলঙ্ক দান।

খুকির জন্মদিন

খুকির জন্মদিন মানেই—
সাত সকালে বৃষ্টি,
ক্লান্ত রোদ্দুর
নরম বিকেল।

আমি বলেছিলাম,
দেখ্, এই বসন্তে যদি বৃষ্টি হয়
তবে কিন্তু তোকে উপহার দেব
হলুদ পৃথিবী
জংলা ফুল
ঢেউশুদ্ধ সমুদ্দুর।

খুকি নরম চোখের পাতা
আল্‌তো আয়াসে বন্ধ করে বলল,
সকাল থেকে আমার কাছে থাক্
তাহলে বৃষ্টি হবে না।

আমি বললাম,
কেন আমি কি গোটা সূর্য উপহার দেব তোর জন্মদিনে?
খুকি হাসল।
অমনি কমলা লেবুর মত হল্‌দে রঙের
নরম রোদ
আমার পিঠের ওপরে সশব্দ
আদর করে গেল।

আমি বললাম,
এটা হচ্ছে কি!
খুকি বলল,
যেমন করে ভোরের পদ্ম-কুঁড়ি
গভীর-গোপন প্রত্যাশায় রোদ ভিক্ষা চায়
তুই আমার সেই রোদ।

সেদিন থেকে খুকির জন্মদিন মানেই
সাত সকালে নিবিড় রোদ
দুপুরে ফুরফুরে সুখ
বিকেলে বসন্ত রঙীন।

প্রত্যাশার গান

অভিমান আর অনুযোগের
পাহাড়ী পথ টপকে
এস আর একবার।
নীরব অভিমান যদি রডোডেনড্রনগুচ্ছ হয়ে
ফুটে থাকে
তবু ক্ষতি নেই।

বাগিচাব ফুল না পাও
এবার রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনো
একমুঠো ঘাসফুল।
নীলাকাশের শুভ্র মেঘবালিকা হয়ে যদি আসতে না পার
তবে বৃষ্টি হয়ে এসো
আমি তাতেই খুশি হব।
তবুও অন্তত একবার এসো
বহুদিন দেখি নি তোমার।
আসবে তো
একবার?

স্বপ্ন এবং ঘুম

আমার আত্মনাশী মনের সামনে
দাঁড়িয়ে সে বললে,
'তুমি বড় ভীরু। শুধু নিজের কথাই ভাবো!'

তার সজল হাসি অদৃষ্টের মতো
আমার স্বপ্ন নেয় কেড়ে
ঘুম চোখে বিছানার চারপাশ তন্ন তন্ন খুঁজে
কোথায় পেলাম তারে!

হৃদয়ের বাঁদিকে যেখানে তার বসতি
সেখানে বেদনায় অবুঝ যন্ত্রণা।
যন্ত্রণা মুক্তি পেতে একের পর এক ওষুধ
ডাক্তারের পরামর্শ মেনে।
ওষুধের সাধ্য কি, বেদনার জট খুলতে পারে!

মনের কষ্ট, রাতের অনিদ্রা, অবচেতনের স্বপ্ন
স্বপ্নের মধ্যে করুণ সখেদ হাসি
হাসির মধ্যে কটাক্ষ
কটাক্ষে সেই ইঙ্গিত— 'তুমি শুধু নিজের কথাই ভাবো!'

সারারাত হৃদয় জুড়ে জ্বর
জ্বর দীর্ঘস্থায়ী হলে
সবার চিন্তা —
আমি জানি এ যাওয়ার নয়।
তার কষ্ট মুছে না গেলে আমার এ হৃদয়-দহন
শীতল হয় কি করে।
সব অসুখ ওষুধে সারার নয়।

তিন পুরুষ

আমি যখন ক্লাস নাইনে
তখন বয়স ছিল পনের।
লজ্জা। সংকোচ। আড়ষ্টতা।
জয়দা, যে আমাকে টিউশান পড়াত
আমাকে সেকি বকাবকি।
মনে আছে, জয়দা আমাকে ধরা গলায় বলেছিল,
'তুমি এত ভীত কেন বলত?'
জয়দা আমার মনটাকে নিয়ে
ইচ্ছেমত নাড়াচাড়া করত।
একটা আস্ত পাকা তালের মত
আমার নরম তুলতুলে মন থেকে 'আরা' বের করে দেখত।
জয়দা এখন পড়ায় না।
ইতিমধ্যে মাধ্যমিক পাশ করেছি
জয়দার বিদ্যাবুদ্ধির রেখা টপকে এসেছি
সেই যে সে আমাদের বাড়ি থেকে গিয়েছে
আর একদিনও চৌকাঠে পা রাখেনি।
আমার মন ততক্ষণে—
নির্লজ্জ। অসংকোচ। অকুতোভয়।

আমি যখন গ্রাজুয়েশনে
তখন বয়স আরও চারধাপ এগিয়ে
আমার শরীর তখন সতেজ স্বাস্থ্যবতী গাছ
শাখায় রসাল ফল,
চুলে বেলকুঁড়ি,
আর মুখটা যেন শুক্লপক্ষের চাঁদ।
পাথরের ফাঁকে স্তিমিত জলে যেমন
অজস্র ছোট ছোট মাছ খেলা করে
আমার জলের শরীরে তখন কলেজময় কত রঙীন মাছ!
কলেজের সব অনুষ্ঠানে তখন আমিই একা
সুদৃশ্য গোলাপ বাগান।
সবার আবেগ আমাকে বেড়ার মত ঘিরে রাখে।
জি. এস. দাদা আমাকে তার বাড়িতে ডাকে।

জন্মদিন বলে কথা!
স্নান সেরে এক মাঠ সূর্যমুখী হয়ে আমি গিয়েছি
জন্মদিনের নেমন্তন্নে—
বাড়িটা ফাঁকা ময়দান।
তবে কি দিন ভুল করেছি।
আমার তখন সেই পনের বছরের পুরনো
লজ্জা। সংকোচ। আড়ষ্টতা।
মনের ভয় কবে গিয়েছে কেটে—
কিন্তু মেয়েদের শরীর ঘিরে থাকে যে পবিত্রতা।...
জি. এস. দাদা শুনিয়েছিল
সূর্যমুখী আমি তোমার সূর্য উপহার দেব
সে বিশ্বাসে আমি হারিয়ে গেলাম
শূন্য মাঠে।

কলেজে পা রাখার আগে
জয়দা মনের ওপর কত পরীক্ষা করেছে।
ভেবেছিলাম, জয়দা বুঝি
আমার ছায়া-ভেজা অশ্বত্থ গাছ।
পরে দেখলাম সে
দীর্ঘ নিশিঘেরা চৈত্রমাস।
কলেজে পা রেখে
জি. এস. দাদার সূর্য ধরে দেবার আশ্বাসে ভেবেছিলাম
আমি নষ্টমেয়ে হলে ক্ষতি কি
যে আমাকে নষ্ট করেছে
সেই তো আমার থাকছে।
এই আশাতে দুপুরে বৃষ্টি, শরতের দুধ সাদা মেঘের ফেনা,
বড়লোক জোৎস্নার আলো গায়ে উড়াল পক্ষির ডাক
সব কিছুতেই সাড়া দিয়েছি।
কতবার ব্লাউজের হুক ছিঁড়েছে
আঁচলের ভাঁজ গিয়েছে খুলে
তবুও বৃষ্টি হয়ে ধুলোয় মিশেছি ঘর পাব বলে।
কিন্তু পাইনি।

অবশেষে সাতপাকে বিয়ে।
এখনো মন জয়দার কণ্ঠস্বর হয় শোনায়—
'এত ভীত কেন?'
আমি তখন তুলোর মত উড়ন্ত মনটাকে রাখি চেপে।
মন থেকে দেহের দিকে ফিরতেই
অজান্তিক ভীতি আমাকে তাড়া করে
আমি শক্তদেহে থাকি আড়ষ্ট হয়ে।
আমার সমর্থ বোদ্ধা স্বামী হেসে বলে,
'একটু ভীতু হলে ক্ষতি কি?'
আবার তখন ফিরে আসি পূর্বের বয়সে—
আর তখন আমায় ঘিরে থাকে,
লজ্জা। সংকোচ। আড়ষ্টতা।

ঢেউ

মা তুই যতই বোঝাস না ক্যানে
    আমি তোর জামাইয়ের ঘরে যাবনি।
প্রতি রাতে এক গলা মদ গিলে
        ঘরে ফেরে।

তুই অবশ্য বলেছিলি
    ব্যাটা মানুষের একটু-আধটু নেশা করতে হয়।
সেই থেকে আমি শান্ত সমুদ্রের স্রোত।

কিন্তু বল্ মা, নেশার ঘোরে
    স্বামীহারা বুচির মার ঘরে ঢুকলে
            সমুদ্রে কি তুফান ওঠে না?

আনমনে ও কামনা

আনমনে

জারুল বনে—
হরিণীর খোঁজে শিকারী।
এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বৃষ্টি
আকাশের নীলাভ চোখে।
ঝড়ে কাপড়ের আঁচলা ওড়ে সবুজ বনস্পতির।
হরিণের করুণ-কামনায়
জারুল বনে গভীর কৃষ্ণ-কুয়াশা পড়ে ঝরে।
শিকারী ফেরারী।

কামনা

সমুদ্র তুমি তটের বুকে শরীর এলিয়ে
কি সাধ মেটাবে
যদি আকাশে ভুঁইচাঁপা নক্ষত্র না হাসে?
জলের ফেনপুঞ্জ বুকে তুলে
পিছল ফিরতেই শুধু ঘাম।
প্রভাতের লাল্‌চে আঁধার
সাঁঝের বেলা ঘণ্টা না বাজাতেই
দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ে—
অমাবস্যার কোমরে হাত রেখে দিনের স্বপ্ন।

পবিত্র পাপী

শুনেছিলাম চড়ক পূজা হচ্ছে ধুম-ধাম করে
রক্ষাকালী ধামে।
জ্যান্ত শিব-পার্বতী ঘিরে
হাজার লোকের মেলা।
এরা অবশ্য কেও লোক নয়,
ভক্ত।

'ধর্ম' শুনলেই আমার মনের বারান্দায়
দুলতে থাকে কমলা লেবু।
গৈরিক রঙ্
শুভ্র মন
সুগন্ধী সাবধান।

ভীড় নিঙ্ড়িয়ে সামনে দাঁড়ালাম।
শাঁখের ভৈরবী নিনাদ
বাতাসের কান ঝালাপালা।
ধূপের পবিত্র গন্ধ।

মন্দিরের সঙ্গে চোখের ভাব জমে উঠলে
দেখা যায় ধুতরা, বেলপাতা, ভাঁটুই ও
আলতার থেকে শৌখিন জবার
রেষারেষি।

ফুলের সীমানার গা ঘেঁষে
চুপ্‌টি করে বসে আছে
গাঁজা আর দেশি চোলাই।
এগুলি নাকি বাবার
রসাল প্রসাদ।

একবস্ত্রা মেয়েরা সকাল থেকে
ভিজে লাল পেড়ে শাড়িতে
গলায় দুল্‌ছে গামছা।
ওরা দণ্ডি কাটবে
মানত পূরণে।

বাবার মাথায় ফুল।
ফুল নাকি ঘূর্ণিঝড়ের মত
সবেগে ওপরে উঠে
সটান নীচে নামে।

ধামের ছোট মেয়ে
হা-পিত্যেশ নয়নে
তাকিয়ে থাকে শিবলিঙ্গের দিকে।
বাবার ফুল নড়েও না,
পড়েও না।

ভক্তদের মধ্যে কানাকানি।
তবে কি মেয়েটির গত জন্মে পাপ ছিল!
নাকি এ জন্মে
যোগের অঙ্ক ভুলে
সবকিছু বিয়োগ।

মেয়েটির চোখে হিমানী সম্প্রপাত।
ধূপ নিজেকে জ্বালিয়ে
অবশেষে চিতা-ভস্ম।
প্রদীপের তেল সীমান্ত রক্ষার
লড়ায়ে নিঃশেষিত।
পোড়া গন্ধ
সলতের।

ভক্তরা ভাবল মেয়েটি করেছে কোন সর্বনাশ।
তার মন দিয়েছে কাকে
এমনকি দেহ!
পাপস্খলন চায়।
বড় ঠাকুরের পাঁচালির
শেষ পাতা উড়িয়েও
পাপ নামে না
বরং পাপ, ক্লেদ, নোংরা
উঠতে থাকে পা থেকে নাভি
বুক অবশেষে কপালে।

আদেশ হয় এ পোড়ামুখি
ধামে থাকতে সাধনার সোজা পথে
কাঁটাতারের বেড়া পড়বে।
সুতরাং বিয়ে দিয়ে
বিদায় কর অলক্ষ্মীকে।

তড়িঘড়ি পুজো শেষ।
মেয়েটি নিস্তেজ।
তিন দিনের অনাহারী উপোস দেহ।
ভক্তরা ছুটল।
রাত শেষ হওয়ার আগেই চায়
বিয়ে।

মেয়েটি পাপী।
তাই বিয়ে।
বিয়েতে দুটি দেহ ভাগাভাগি হয়।
পাপও।
অন্তত একরাতেও যদি
কিছুটা পাপ
গোপন বারুদে পুড়ে ছাই হয়।
তাই বিয়ে চায়।
মেয়েটির বিয়ে হল।
চল্লিশের পাত্র
কাঁচা সবেদা ঘণ্টার ব্যবধানে
দেখতে চাইল পাকা।
সবেদার গায়ে এখনও তুষ ছাড়ায় নি।
নখের আঘাতে সাদা আঠা
তারপর লাল আঠা।
এক সময়
সবেদা সুসিদ্ধ
কাঁচায় পাকা।

মেয়েটি পরের বছর চড়কের পুজোয় বসে নি।
দেবীর বারণ।
'পোড়ামুখী মেয়ে সহ্য করে
স্বামীর লেপে ঢুকতে পারলি নে।
না হয় মুখ দিয়ে রক্ত উঠত।
কলেরায় কত মেয়ে
তো মরে।
মরলেই বা।

স্বামীর জন্যে কত মেয়ে তো মরে।
দেহ দিয়ে
মন দিয়ে
বাচ্চা দিয়ে
অবশেষে
প্রাণ দিয়ে।'

মেয়েটি ঘরে বসে চুপ্‌চাপ্‌।
জোড়হাত।
হঠাৎ মায়ের আদেশ।
আজ রাতে তোর বিয়ে।
আবার!
হ্যাঁ, মা বলেছে,
মেয়েটির বর গ্যাছে মথুরায়।
মথুরা এখন বাংলাদেশে
ওখানে তার অন্য রাধে।

সুতরাং পাপ মুছতে
আবার বিয়ে।
পাত্র এবার বেজায় ভাল।
ধর্মের প্রতি আস্থা আরও।
মার কথাতে

রাতের বেলা রবির মেলা
নক্ষত্রের টিপ কপাল জোড়া।
মেয়েটি বসল বিয়েতে
চড়কের ফুল ঘূর্ণিঝড়ে!
ফুল পরেছে। ফুঁ বড় ভার।

গতকাল পেপারে
চক্ষুবিস্ফারি খবরে
মেয়েটি মরেছে বিষ খেয়ে।
ধামের মা নাকি তাও জানে।
এ যে হল ভবিতব্য
আগে থেকে স্বর্গে গেল।

স্বর্গের জমি ভক্তি টাকা
স্বামীদেবতা সর্বনাশা।
এখন নাকি বন্ধ চড়ক।
মেয়েটির আত্মা দেখে নরক!
চড়কটাই যে বড় নরক।

আমি তো মেঘ হয়ে

আমি তো মেঘ হয়ে
        আকাশের তল ছুঁয়েছিলাম।
তুমি বাতাস হয়ে
        আমায় নীচে টানলে।
আমি অঝোরে ঝরতেই
        তুমি শুকনো মাটির চাদর বিছালে।
বছর না ফিরতেই
        সবুজ সন্তানটা
আমায় মা বললে ডাকলে।
        তুমি রৌদ্র হয়ে
আমায় আকাশে ফিরতে বললে।
        কি করে সবুজকে ফেলে যাই!

আত্মপীড়ন

মুক্তরামকে কত করে বলেছিলাম
দরজা-জানালা বন্ধ ঘরের এই গুমোট গন্ধ
আমার ভাল লাগে না।
তুমি বরং নীল আকাশের সঙ্গে আড়ি পাতা
ছাদটাকে দাও খসিয়ে
তারপর
সোনালী রোদের টুকরো দিয়ে
ঘরটাকে দাও রাঙিয়ে।
কথা শুনলে না।

ঘরের ইজ্জত বাড়ানো ঝাড়লণ্ঠন ভাল লাগে না আমার।
রঙ্-বেরঙের হাজার টুনি লাইটের আলো
শত প্রচেষ্টাতেও ম্লান করতে পারে না
মিট্‌মিটি চাওয়া তারার প্রসন্ন হাসিকে।
তবুও
ওরা জোছ্‌নার প্রেমে ভাসা চাঁদনী আলো
আর
গভীর রাতের তারাখসাকে
দেখতে দেয় না আমায়।

বাবার প্রভাতি গান গাইবার অনেক আগেই
নৈঃশব্দ ভেঙে দিয়ে কাহার পাড়ার ল্যাংড়া কৃষক
এক পায়ে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে
মাঠে চলে—বলদজোড়া নিয়ে—জমি চাষ করতে।
পেছনে তার ঘোমটা টানা সলজ্জ বৌ।
ভীষণ ইচ্ছেয় তেতলা থেকে দৌড়ে গ্যাছি রাস্তায়—
আমিও নাঙল দেব আমন চাষের জন্যে বৃষ্টিভেজা জমিতে।
দুপুরে শ্যালো মেসিনের জল আসার ফাঁকে
নুন, লঙ্কা, পিঁয়াজ দিয়ে এক পেট খাবো
টোকো পান্তা।

মুক্তরাম দ্রুত পায়ে এসে
চুপি চুপি আমার কানে মুখ রেখে বলে
তুমি বড় ঘরের ছেলে,
তোমার অনেক কিছু চাইতে নেই।
কিন্তু
না চাইতেই তো আমি পেয়েছি অনেক
গাড়ি-বাড়ি-ঘড়ি থেকে সোনার চামচও
তথাপি
শান্তি পাই নি আমি।

ঝিঁঝি পোকার ডাক
আমের মুকুলে বসে মধুকরের অকৃপণ চুম্বন
নিস্তেল আঁধারের কোলে ভর দিয়ে
না খেয়ে ধুকতে থাকা
গড়পাড়ার খোকন ভায়ের কণ্ঠে সুরে-বেসুরে
ধ্বনিত হওয়া ভাটিয়ালী ;
নদীয়ার কৃষ্ণপদর তিন বছর মেয়েটির ঝুমুর নাচ্
ভাল লাগে আমার।

বাবার নীল রক্তের ঐতিহ্য ভুলে যাই,—
যখন দুধের মত নরম ডানার বক
শেষ বিকেলের আলোয় ভিজে বাসায় ফেরে
কিংবা ধূসর পেঁচা খাদ্য না পেয়ে
বক্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ;
আর তারই সামনে একটি পোকা ধরে
ছোট্ট দোয়েল তুলে দ্যায় সদ্যোজাত
ছানাটার মুখে।

দাদু ভাবতেন, আমি বড় ডাক্তার হব।
দাদুর কথা রাখতে রাত-দিন পড়েছি
অবশেষে গোয়েঙ্কাদের ছোট মেয়ের
অবৈধ কাঁচা ভ্রূণটাকে হত্যা করে
আমি নাম করা ডাক্তার হয়েছি।

তবুও
চোখের পাতা মুদে এলে
চারঘাটের স্কুল মাঠ
মছলন্দপুরের রেল স্টেশন
সলুয়া মাঠের বোরো আউশের প্রসারি বিল
এবং
সবুজে ঘেরা ঝিঙে, পটল, বেগুন,
কপি, গম আর হলদে সরষে ফুল
ডাকে আমায় বারবার।

মুক্তরাম এখন আর বেঁচে নেই।
তাঁর শাসন, বাবার পীড়ন ও দাদুর মিথ্যা
আভিজাত্যও এখন নেই।
তথাপি গ্রামে ফিরতে পারি না।
মুক্তরাম আজ তুমি নিজেই মুক্ত।
কিন্তু বলতে পার, আমি কবে উন্মুক্ত ভুবন পাবো?

উদ্‌ভ্রান্ত যুবকের কাহিনি

এক উদ্‌ভ্রান্ত যুবক
সারাদিন কারখানার গেটের সামনে বসে থাকে কর্মের আশায়।
ক্ষুধার্ত চাতক চোখ
ইতস্তত ঘোরে গলি থেকে চওড়া রাস্তায়।
ঝড় ওঠে অনাবশ্যক আকালে
আৎকে উঠে ছেলেটি ঘরে পালায়।

পরের দিন আবার
সেই উদ্‌ভ্রান্ত যুবক
প্রতীক্ষার ভীড়ে এ দোকান থেকে সে দোকান।
মনিবের কথায় আকাশ থেকে ফুলকি আগুন
মাথার ওপরে পড়লেও
দাঁড়িয়ে বাতের রুগী হওয়া ছাড়া অন্য উপায় থাকে না।

উদ্‌ভ্রান্ত যুবক বোধহয় জানে না
এই ব্যস্ত শহরে হৃদয় বিস্তারের অবসর নেই।
নেই 'সততা' শব্দটাকে পুষে রাখার মত কোনও নিভৃত স্থান।
তবু গেটআউট, লকআউট শব্দের বেত্রাঘাত শুনেও
ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকে গভীর প্রত্যাশায়।
বাবার নেই পেনশন
তদুপরি চার-চারটি বোন ঘরে থাকার টেনশন
চরম অপমানকে যৌতুক বলে মনে হয়।
উদ্‌ভ্রান্ত যুবকের চোখের সামনে
ক্লিন্নতা জঞ্জালের মত ভীড় জমায়।
অবশেষে পঞ্চায়েতের দ্বারস্থ হয়
নবশিক্ষার প্রকল্পে দু' হাজার টাকার শিক্ষক হওয়ার জন্যে।
কিন্তু ছেলেটি জানে না
জোতদার শ্রেণির কঙ্কাল থেকে জন্ম নেওয়া দূর্বা
পঞ্চায়েত প্রধানের পুজোয় লাগে এখন।

মানুষের মনে শ্যামল সতেজ সবুজ মনটি কখন মরে
পিঙ্গল বর্ণের হলুদ রঙে বিবর্ণ মন ভরেছে এখন,
তাই 'স্বপ্নচরে'র প্রতীকি সাপ নিজের দেহকে আত্মসাৎ করে
উগরাতে না পেরে আত্মহনন করে।
তাই মানুষের দরজায় ঘুরে ঘর্মসিক্ত দেহে
যুবকটি বাসায় ফেরে।

প্রতিদিনের মত বাবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পতন
বোনের নীরব অশ্রুপতন আর পড়শীর প্রত্যহ স্বভাবজাত ফোড়ন
যুবকটির সমস্ত স্বপ্নকে ফেলে দেয় ঘন কুয়াশার মধ্যে।
প্রেমহীন সমাজের অপ্রত্যাশী আঘাতে
হারিয়ে যায় উদ্‌ভ্রান্ত যুবকের দেহ
যেমন করে হারিয়ে গ্যাছে শহরের বুকে
মেদুর মফস্বল।

নির্জন বিষণ্ণ বিষাদ

ইতিকথা, উপকথা আর
রূপকথা ও পুরাকথার
প্রতিটি অধ্যায়ে
হে প্রেম তোমাকে দেখে
মুগ্ধ নয়ন হয়েছি।

মর্ত্য জীবনের
এই রূপের আগেও
হয়ত বা আমি ছিলাম কাকাতুয়া, আরণ্যক চিতা
বুনো তেউরি কিংবা শটি
গাছ হয়ে—তৃণভোজী, মাংসাশী পশু কখনো।

জান্তব জীবন ত্যাগ করবার প্রত্যাশা নিয়ে
কত রাত হরিণের
গলায় আদুরি জিভ ছুঁয়ে
নয়ন মুদেছি।
স্বভাবের চিরন্তনী পথে হেঁটে
তার মাংসের স্বাদ উপভোগ করিনি।

শ্রমিক বিক্ষোভ থামানোর
বাহাদুরি প্রশ্রয়ের লোভে
ব্যাঙ্কের পাশ বই যোগ ও গুণের অঙ্কে
ভরিয়ে দেইনি;
অনাত্মীয়দের আত্মীযতা দেখে
মাসের শেষে সংসার সাঁতরানোর জন্যে
এ হাত পেতেছি।
তথাপি নীতিকে নতির ঠিকানা
দেখাই নি।

অবশেষে বিক্রয় করেছি
আস্ত একটা হৃদয়।
কিন্তু বিপণনের হিসেব না বুঝে
নিতান্ত ঠকেছি—কেঁদেছি
নির্জন বিষণ্ণতার সঙ্গমে।
তবু মনের মানুষটির এখনও মন পাইনি।

শ্রীমতি তোমার জন্যে

পেরেছি।
অনেক ভেবে কি উপহার দেব তোমায়
অবশেষে ঠিক করতে পেরেছি।

তোমাকে দেব—
গোটা পদ্মদীঘি, নরম চাঁদ, আকাশ-ভর্তি জ্যোৎস্না।
তোমার মন ভরিয়ে দেব—
প্রবাল দ্বীপের স্বপ্ন দিয়ে।

তোমার চুলের খোঁপায় গুঁজে দেব—
ঘোর অরণ্যের শান্তি।
শাড়ির ভাঁজে ছড়িয়ে দেব জংলি গন্ধ।

আর সন্ধ্যে বেলায়—
যখন সবাই চলে যাবে,
শূন্য ঘরে বসে শোনাব
টুসু গান।

যে আমারে পারি নে চিনিতে

সকালে আমি টকটকে লাল সূর্য
অফুরান আলো
বর্ণময় বিভূতি।
দুপুরে ঝর্ণা-ব্যস্ততা
কর্ম্মময় ঝটিকা বিশ্ব।
বিকালে নষ্টস্মৃতি
বিষণ্ণ পরবাস।
সন্ধ্যায় লোকগীতি
কোনদিন ঝুমুর নৃত্য।
রাতে নিস্তব্ধ হিমালয়
সাদা বরফ-নিংড়ানো চোখের জল।
ভোরে শিশির স্নান
শিউলির আদুরে চুম্বন
কচুরিপানার নীচে
তেলাপিয়ার পুচ্ছ-নাচন।
এই নিয়ে সকাল থেকে পরদিন ভোরে আমি
যে আমারে পারি নে চিনিতে।

ভীরুতা আমার পিছু নেয়

ভীরু মন আমার
প্রতি মুহূর্তে বন-বীথির মত কম্পিত।
বুক করে দুরু দুরু
তোমাকে ছুঁতে সাধ হয়।
তবুও
অজান্তিক ভীতিবোধ
আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনকে হঠাৎ দেয় বাড়িয়ে।

হৃদয়ের বরফ জমিয়ে জমিয়ে
হিম পাথর হয়।
এক কুচি জলও তা থেকে পড়ে না গড়িয়ে
তবুও
আমি জল হওয়ার ভয়ে ভীত।

আমারও মন আছে
ভালোবাসা আমারও সমুদ্রের তল ছুঁয়ে যায়।
কিন্তু সমুদ্রের ওপরেও তো বয়ে যায়
কালীদহের ঝড়।
    আমার ঝড়কে বড় ভয়।

পালাবদল

দিদি রক্তবেচে তুই আর কত পড়াবি!
আমি যখন একে, তুই তখন ষোলতে।
বাবা মরলেন রাজনীতির শিকার হয়ে।
মা গেলেন চাটুজ্জে কাকার সঙ্গে
একটি চাকরি জোগাড় করতে।
চাকরি হল।
কিন্তু চাটুজ্জে কাকার ইচ্ছে পূরণের অভিলাষে
পঁয়ত্রিশ উত্তীর্ণ মাকে
মরতে হল অবৈধ সন্তান পেটে ধরে।

আমাকে পড়াবি বলে
তুই ছুটেছিস যন্ত্রের মত এ অফিস থেকে অন্য অফিসে।
কিন্তু তুই পোড়াকপালি।
তোর মধ্যে ছিল পুরুষালি গাম্ভীর্য
আর আপোষহীন ঔদার্য।
তবুও কিছু হত—
কিন্তু তুই গোলাপ দেহ হতে পারলি না
পাহাড়ি ক্যাকটাসের কাটা সর্বশরীরে তোর
অহংকারের মত নিরেট আভিজাত্যকে ছিন্ন করে।

বেচারা দিদি তুই
পারলি না ঠুনকো দেহটাকে ধার দিতে
নাই বা অক্ষত ফেরৎ পেতিস
তবুও তো রক্ত বিক্রি থেকে বাঁচতিস।
আমি কিন্তু বিবেকী-বিধবা হতে নারাজ
তাই চললাম তোকে বাঁচাতে।

যে জীবন এঁটো পাতার আহার্য স্তূপে বাঁচে
সেই দেহটা এঁটো হলে ক্ষতি কি?
তাছাড়া, আমি এখন ষোলতে, তুই একত্রিশ।
নিজের শরীরের যত্ন নিস।

গাঢ় সন্দেহ

মলয়বাবু, আজ হিম পড়েছে
দেহে আমার।
সমুদ্রের তল ছুঁয়ে যাওয়া
আপনার সুগভীর বোধ
আমার নারীত্বকে করেছে শাপমুক্ত।

অফিসে পৃথক দু'টেবিলে বসে
সুগভীর বিশ্বাসে
আমরা কাজ করে চলেছি
এই পাঁচটি বছর।
এর মধ্যে কত ঢেউ ফিরেছে
তটের বুকে অবিশ্বাস্য আছাড় খেয়ে।
কাঠ-কুটোর মত ভেসেছে
পুরুষ-কর্মী বন্ধুদের অবৈধ কামনার
কত বেহিসাবী প্রত্যাশা।

গত বছর পুজোর ছুটির ঠিক আগের দিনটিতে
সমস্ত কাজ সেরে
অফিস থেকে বের হতে সওয়া আট্‌টা।
গরমে দেহটা ভিজে বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি।
যেন শিশির-সিক্ত পদ্ম-পাতা থেকে
জল টুপিয়ে পড়ছে।
একাকী বসে হাওয়ার স্রোতে ভাসতে
সবগুলো ফ্যান দিয়েছিলাম চালিয়ে।

অবসন্ন দেহটা শীতল হাওয়া গায়ে জড়িয়ে
আবশ্যক জড়তায় আড়ষ্ট
ঠিক তখনি মুখার্জিবাবু এলেন
আমার শুন্‌শান্‌ ঘরে।
তিনি কফি অফার করলে
আমি না বলার আগেই
কফি মিলল হাতের কাছে।

তারপর আমি বেহুস
আমার দুই স্তনে তখন পাহাড়
চোখে নীল মদ
নাভিতে হলুদ রোদ্দুর
পিঙ্গল ঘাসের ঝোঁপ পেরিয়ে
মৈথুন বজ্র-বেদন।

সুনীতার তারস্বর চিৎকারে
স্বামীর সঙ্গে সেই কবেকার
পুতুল খেলার স্বপ্ন ফেলে
দাঁড়ানোর চেষ্টা করলাম।
অনেক কষ্টে বাড়িতে ফিরে
একসময় উপলব্ধি করলাম
আমি বৈধব্য হারিয়েছি।

সেদিন থেকে আমার কাছে
পৃথিবী ঝাপসা
আকাশ মেঘলা
সন্ধ্যা আনে নির্জন বিষণ্ণতা।
সুনীতাকে কথাটুকু বলতে গিয়েও
মেঘ দেখে বিছানা গোটানোর মত
পিছিয়ে এসেছি কতবার।
সুনীতাকে মুখার্জীবাবু ভালোবেসে কাছে টেনেছে
গত বছরের আগের বার।

মুখার্জীবাবুর চাকুরি আমার স্বামীর প্রশ্রয়ে।
মৃত্যুর আগে তিনি বলেছিলেন
আমার সুবিধা-অসুবিধার কথা তাকে বলতে।
কষ্ট করে আমায় জবানবন্দী দিতে হয়নি।
মুখার্জীবাবু একপ্রকার জোর করেই দিলেন
নষ্ট জোছ্না, নির্জন রাত,
আর নির্ভেজাল মৈথুন।

মলয়বাবু, এর পরেও বলছেন অফিস করতে।
ভয় হয়, এর পর যদি
আপনিও...।
আপনিও তো আমার স্বামীর বন্ধু ছিলেন।

মহাজাগতিক ধ্বনি

বহুদিন ধরে
অ-সূর্য দর্শন কর্ম
শেষ হলে
ট্রেনে চেপে বসলাম।

হিয়ার অন্দরে
যেখানে অনুভূতি
থাকে গোপনে
সেথা হতে
তোমায় দেখলাম।

দেখলাম—
তোমার গায়ে
মেঘলা শাড়ি
দু'চোখ জুড়ে
কচি কলাপাতা
নাভিতে ভাসছে
নরম টোপর পানা।

দেখলাম—
তোমার কোল জুড়ে
নারকেল সুপারির মেলা।
চুলে দুলছে তোমার
বক্, গাঙ্চিল আর
চড়ুই কাকাতুয়া।

দেখলাম—
তোমার হাসিতে
বসন্তের আনাগোনা
কান্নায় ঝরতে থাকে
শ্রাবণের ফেনা।

দেখলাম—
তোমার নৃত্যে
চঞ্চল ঝর্ণা
সুরে তোমার
ভেসে বেড়ায় নীল নীলিমা।

দেখলাম—
তোমার নীরবতায়
গ্রাম্য শিশির
লাউ পাতায় জল নামায়
প্রতিবাদে তোমার
অকস্মাৎ মেদিনী
ভূকম্পন জাগায়।

দেখলাম—
লাল ফিতের
ফাঁস ছিঁড়ে গ্রাম্যধুলো মাখতে
সেদিনের লাজুক মেয়েটাকে
টাটকা খবরে আনতে।

এত দেখেও
দু'চোখ ভরে দেখার
তীব্র ঢেউ বুকে
সমুদ্রের তটে এসে
মিশে যাই
'যৌবন জল-তরঙ্গে'।

আত্মরতি

১

খুকি তুই আমার বেহেসাবি রাত।
তুই আমার চোখে অবশেষ আষাঢ় মাস।

২

খুকি তোকে ভুলব বলে ফেঁদেছি কত ফাঁদ।
বিশ্বময় আছিস দেখি, কপালে রূপসী চাঁদ।

৩

খুকি তোর জন্যে কাটিয়েছি অমাবস্যা রাত
যখন তুই এসেছিস তখন পূর্ণিমা বসিয়েছে আলোর হাট।

৪

সকাল থেকে সন্ধে তোর আসন বুকে নিয়ে
কাল কাটিয়েছি দেখব বলে একযুগ ধরে।

৫

অভিমান আর অপমানের বারুদের ওপর বসে
আপন হাতে দেশলাই ঠুকেছিস তুই মনে।

নৈরাশ্যের মুক্তি

অবশেষে ফিরিয়ে দিয়েছি
পাথুরে নৈরাশ্যকে।
অলৌকিক যাদুশক্তির মতন
তুমি দু'হাত বাড়িয়ে বলেছিলে
'দাও।
কিছু অন্তত দাও।'

স্বপ্নের বসন্ত
শেষবারের মতন যোনি দেশ বিছিয়ে
আমারে করেছে হনন।
ছিন্ন শিকড়, অযুত বর্ষণ, অসম্পূর্ণ জীবন
ত্রিশঙ্কু আমি তখন।

দু'হাত বাড়িয়ে বললে
'দাও।
কিছু অন্তত দাও।'
হাত দিলাম দেওয়া নেওয়ার ঝুলিতে—
দেখি পড়ে আছে শুধু,
সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসীর পরিত্যক্তা নারীর মত
জাগরূক নৈরাশ্যরাত।

দু'হাত বাড়িয়ে বললাম
'নাও
একটুখানি নাও।'
বেহুলার মৃতস্বামী ভিক্ষার মত
আঁচল পেতে বললে
'দাও
পাথুরে নৈরাশ্যসব দাও।'

প্রতীক্ষমান

আজ পঁচিশটা বছর
আমি সূর্যের মুখ দেখি নি।
ঘরে দরজা লাগিয়ে
বসে থেকেছি।
সান্যাল বাড়ির বিচারে, 'আমি নাকি নষ্ট মেয়ে।
তাই ঘরে দরজা বন্ধ।
কিন্তু গভীর রাতে
কড়া নাড়ার শব্দ।
কান পেতে শুনেছি—
সান্যাল বাড়ির বড় ছেলের কণ্ঠ।
'বুচি দরজা খোল্
আমি তোর প্রতীক্ষায়
দ্বারে আছি দাঁড়িয়ে।'

এলো-মেলো

১

ভীরু মন
জোনাকির পুচ্ছ-আলোয়
দ্যাখে অর্ধেক জীবন।

সুপুরুষ দেবদারু সটান মেদহীন দেহে
শীতের অলস বিছানা ছেড়ে
সকালের দুষ্টু রোদটাকে চায় ছুঁতে।

কুড়ি বছরের হৃদয়-বালি ছেলেটির মনের
ছায়া ঢাকা সুদীর্ঘ সরল রাস্তায়
শিকারে-অভিজ্ঞা মেয়েটি
কামনার কাঁটা বিছিয়ে দ্যায়।

২

আমিষ রক্তের
নোন্‌তা স্রোতে
শ্যাওলা ভাসতেই
রাস্তার পাগলী তেরো মেয়েটাকে
বাড়ি ডাকে মনস্তাত্ত্বিক ডাক্তার।

সুগন্ধী সাবানে স্নান করিয়ে
খেতে দ্যায় সুস্বাদু খাবার।
তারপর চিকিৎসা চলে
প্রথমে মনের ওপর
তারপর দেহের ওপর।
এক সময় বুকের ওপরে
পাঁচ আঙুলের মায়া।
মায়াবদ্ধ জীব
চৈতন্যময় জীব
দয়ালু জীব
কামার্ত জীব।

পাগলি তাই কিছুদিনের মধ্যে জন্ম দ্যায়
মায়া, চৈতন্য, দয়া, কামনা ঘেরা জীব।
তারপর কামনাশুদ্ধ পাগলী হারিয়ে যায়
পদ্মপুকুরের জলে।

৩

কচি ঘাসের ওপর মুখ রেখেও
বৃদ্ধ হরিণ সজল নয়নে
অবাক পিছু হাঁটে!
গত বছরে এই ঘাসে মুখ রেখে
সাবালিকা হরিণী
শিকারীর গুলিতে মরে!

৪

সূর্য নিভে গেলে
তরুণ সন্ন্যাসী
পাগড়ি খোলে।
তারপর দরজা জানালা বন্ধ করে
কম্পিউটারের স্ক্রীনে হিসাব দেখে
কাম্-ক্রোধ ব্যাঙ্কে জমেছে মোটা অঙ্কে।

৫

সন্ধ্যার শেষে
অবসন্ন ধূসর ডানা দু'টি গুটিয়ে
কামনার খড়-কুটো মুখে
সপরিবার গাঙ্-চিল
নিস্তব্ধ রজনীর প্রেমে।

দিনান্তের গান

খুকি, তোর জন্যে রেখেছি দুপুর মেঘলা আকাশ
হাতের মুঠোয় ধরেছি নিশুতি সর্বনাশ।
ঘূর্ণিপাকে, রক্তদানে, জীবন-সংগ্রামে
আস্ত সূর্য ধরেছি আলো পাব বলে।

ইস্কুলে, কলেজে, ভীড়ে, নির্জনে—
তেমাথায় দাঁড়িয়েছি তোকে দেখব বলে।
বাড়িময় ঘণ্টা বাজিয়েছি, ছুটি হয়েছে জেনে
নদীর বুকে বান এনেছি তোকে ছোব ভেবে।

খুকি তোর জন্যে মৎস-উৎসব করেছি
তুই মাছ ভালোবাসিস বলে।
পড়শীর মুরগী ধরেছি
মাংস-রুটি চলবে ভেবে।

খুকি তোর জন্যে অন্ধ হয়েছি
ভিতরের দৃষ্টি গ্যাছে খুলে
নিরক্ষরতার মিছিলে কণ্ঠ মিলিয়েছি
স্বাক্ষর হব বলে।

খুকি তোর জন্যে পূর্বাশায় গেছি
দেখেছি শ্বেত পাথরের থালা
গিরিশমঞ্চে বসেছি পাশে মুখোশ-পরা
খুকি তোর জন্যে রুদ্রপ্রসাদকে ডায়ারি দিয়েছি।

খুকি তোর জন্যে লণ্ডনে গিয়েছি
খুকি তোর জন্যে বস্তিতে থেকেছি
তোর কথাতে মিছিলের মুখে থেকেছি
তোর ইচ্ছেতে রাজতন্ত্র নিঙ্ড়ে সমাজতন্ত্র বের করেছি।

খুকি তোর জন্যে পাজি মেয়ে রুবির
সেক্সি রুমালটা বাতাসের গলায় পড়িয়েছি।
দিনান্তে বর্ষা পান করে
সবুজ ধমনীর সতেজ গাছ পুঁতেছি।

খুকি তোর জন্যে পায়ে হেঁটেছি
জগন্নাথের রথের দড়ি ঠেলেছি।
খুকি তোর জন্যে শারদীয়ায় লিখেছি
তোর জন্যে পূর্ণ দোয়াত ভেঙেছি।

খুকি তোর জন্যে কবির বুকে মাথা রেখেছি
শিল্পীর তুলিতে লাগিয়েছি অবশেষ রঙ্
বৃষ্টাভেজা রাতে সেকি বজ্রপাত
তবুও কাটেনি এখনও চৈত্রমাস।

খুকি তোর জন্যে লুসির প্রেম
ফু করে বেলুনে দিয়েছি ভরে
তোর জন্যে পঙ্ক ঘেঁটে তুলেছি পঙ্কজ
দূরদর্শনে গুছিয়ে রেখেছি একগুচ্ছ স্বপন।

খুকি তোর জন্যে 'A' মার্কা ছবি ভুলেছি
তোর জন্যে ছন্নছাড়া জীবন দান করেছি
ঘর গুছিয়েছি ফুলে ফুলে
গোলাপ পুঁতেছি মন-জমিনে।

খুকি তোর জন্যে বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া
বসন্তের এলোচুলে ঘরে বন্ধ দরজা
খুকি তোর জন্যে নিরামিষ জীবন
তোর খুশিতে আমিষ শয়ন।

খুকি তোর জন্যে বামপন্থী লাইন
একেবারে সাদাসিদে ভজন সাধন
খুকি তোর জন্যে অমাবস্যা রাত
ভিক্টোরিয়ায় বসে পূর্ণিমার চাঁদ।

খুকি তোর জন্যে রবিঠাকুরে প্রেম
রূপের মাঝে হাত ঢোকালে অরূপ রতন
খুকি তোর জন্যে মুক্তমালা গলে
নিদারুণ আষাঢ়ে বৃষ্টি না ঝড়ে।

খুকি আজীবন ঘর বাধার চুক্তি
গৃহতন্ত্র দেখাল শান বাঁধানো যুক্তি
খুকি তোর জন্যে অগাছোল রাত
তোর আশাতে আমি এখনও ব্রহ্মচারীর জাত।

খুকি তোর জন্যে ধর্মে দিয়েছি মন
তোর জন্যে শুক্ল পক্ষে বাইশে শ্রাবণ
ধনে জনে আছিস এখন দিব্যি মনের সুখে
আমি আসি তোর জন্যে ভাঙা চাঁদ বুকে।

সুন্দরের আহ্বান

গভীর সঙ্কটকাল এখন।
তুচ্ছ হৃদয় দুর্বলতারে ভুলে গাণ্ডীব তুলে নাও হে শত্রুতাপন অর্জুন।
মহানুভব প্রকাশের নির্বীর্য দয়া প্রদর্শন
দীনতার নামান্তর।

আত্মজ্ঞানী তুমি।
শোক-মোহ-কর্তৃত্বের গাঢ় ঢেউ
নিত্য তুচ্ছ মান-অভিমান আত্মার অমর বার্তা
দানে ব্যর্থ যেন।

আত্মা দুর্বিজ্ঞেয়।
তোমার দেহ যত নারীর সাম্রাজ্যবিস্তারী
গুপ্ত কামনার সুগভীর আলিঙ্গনে—
যতই রক্ত ঝরাক না কেন তথাপি আগামী পৃথিবী তোমারি দখলে।

পলায়ন নয়।
কর্মের পরিকল্পিত কৌশলের মধ্যে
আগামী ভারতের নেতৃত্বে বিশ্বের শান্তি সন্ধানী নাগরিক
খুঁজে পাবে সুস্থ মুক্তি।

অতৃপ্ত স্বপ্ন

সেদিনও তোমার চোখে জল দেখেছি
        হে দুখিনী জননী স্বদেশভূমি।
গুজরাটের দাঙ্গা
        অযোধ্যায় মসজিদ ভাঙা
সাম্প্রদায়িক কত সন্তানের
        রক্তের হোলি খেলা।
এসব চিত্র এখন তোমার ঘরে
        সূর্য ওঠা-নামা।

জানি এর থেকেও সুখী ছিলে
        সাদা গরাদের চতুর্দশী অন্ধকারে।
সেদিন গুজরাট, মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব
        আর বাংলা জ্বলেছিল সদর্পে
তোমার সহাস্য মুখ দেখতে।

অস্ত্র হাতে নবীনা

কবিতা নয় তো শুধু কল্পলতা
    কতবার বিক্ষুব্ধ বিপ্লবের কণ্ঠস্বর হয়ে
        গণদেবতার পাঁজরে আগুন ঢেলেছে।
চাঁদ দেখার পোশাকি ফাগুন ছেড়ে
        কবিতা যখন আগুনের ফুলকি হয়ে
    কৃষকের কোদাল চালানোর ছন্দে
        সবুজের অরণ্যে ফিরে আসে
তখন রাষ্ট্রবিপ্লবে কয়েদি যুবক
        সহাস্যমুখে ফাঁসির দড়ি গলায় পড়ে বলে
            'স্বর্গে চলেছি অমৃত পাব বলে।'

কবিতার গুপ্ত ভাষায়
    অগ্নিচোখে মেদিনীপুর জেলার কোন সদানন্দ
অঞ্জনার হাত ধরে
        বেরিয়ে পড়ে বন্ধুর রাস্তায়।
প্রেমিকের উষ্ণ আলিঙ্গনে অঞ্জনা নীড় বাঁধার স্বপ্ন বুকে
        দিন গোনে না।
বস্তির জলা-জঙ্গলে পচে মরা মানুষদের
ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে যারা
        তাদের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলনে
            কবিতাকে অস্ত্র করে
শাণিত আঘাত হানে তারা।

আকাশ-বাতি

আমার ভাঙা ঘরে এলে
সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালাতে-
আমি রইলাম চেয়ে
তোমা পানে
দুটি অশ্রু নয়নে—

যখন উৎসবে ভরেছিল
আমার আঙিনা
তুমি দাঁড়িয়ে ছিলে দূরে
কাছে এলে না।
আজ নিঃস্ব ঘরে একা আমি
রিক্ত হাতে বসে
হে প্রেম তুমি এসে
আলো জ্বালালে।

সংগোপন

যৌবনকে অর্জিত তপস্যার কোণে
আকাঙক্ষাহীন শূন্যতার খণ্ডিত মাপে
রেখেছিলে বন্দী করে।

হে তাপসী বোরখা খোলো
একাধিক জ্যোৎস্না পুলকিত রাত
দিয়ো না ছুড়ে রিক্ত বেদনার শূন্যতা-মাঝে।

আমি তোমারি প্রতীক্ষায় এখনও
বসন্ত রাতে নির্নিমেষ চোখে
শূন্য বিছানায় আছি পড়ে।

হে তাপসী তপস্যার দীর্ঘ
কাল অতিক্রান্ত করে হয়তো দেখলে
তাপস তোমার শুয়ে আসে মৃত্যুলোক চেয়ে।

যৌবনকে সংগুপ্ত রেখে
জীবনের পুষ্পিত গন্ধে মুখ ফিরিয়ে
আর কতকাল অনিদ্র রাত কাটাবে?

দুষ্টু মেয়ের ইশারা

খেজুর গাছের পাড় বসানো
গভীর নাভি তল
সে হোলো আমার কত সোহাগের
বরফ-ভেজা জল।

দুষ্টু মেয়ের ইচ্ছা আদর
হাস্য কোলাহল
রাগ করেছে আকাশ মাঝে
অবুঝ তারাদল।

ঢেউগুলো সব করছে আদর
পদ্ম-পাপড়ির মুখে
তেলাপিয়ার কোমর-নাচন
বড়শির দিক চেয়ে।

ভিজে চুলে গামছা বুকে
সরল-যৌবন মেয়ে
মুখ টিপে মুচকি হাসে
হ্যাঁ ইশারাতে।

একটি আত্মহত্যার কাহিনি

শুনেছি গড়পাড়া গ্রামের খগেন খুড়োর মেয়েটা
গত রাত্রে অবুঝ যন্ত্রণা বুকে
গলায় দড়ি দিয়েছে।

কলকাতার কর্মকার বাড়ির সৌমি নামের আদরের মেয়েটি
খগেন খুড়োর মেয়েটার ছোট্ট বেলার প্রেমিককে
প্রেমের ফাঁদ পেতে শিকার করেছে গোপনে।

সেই যন্ত্রণায় মনে ব্যথা উঠেছিল
ক্রমাগত কয়েক মাস।
গ্রামের নুন্-ভাতের সহায়হীন মেয়ে
নাগরিক চাতুর্যতার সঙ্গে দৌড়ে ঢের পেছনে—

তারপর বাড়ি গাড়ি বনেদি অর্থের জেল্লা
এসবের সঙ্গে পাল্লা!
কম সাহসের কথা!
তাই সাহসভরে মেয়েটি সন্ধ্যে বেলায় অন্ধকারে হারিয়েছে।

স্বরূপনগরের ছোট দারোগা একটি চিঠি ওর ব্লাউজের মধ্যে পেয়েছে,
"সৌমি শেষে প্রেমটাও চুরি করলে!
তোমার তো অনেক আছে
হাজার চেনামহল, বাবার আভিজাত্য ও
কত বন্ধুর রাতভোর আদর মাখানো প্রেম।
কিন্তু আমার আছে শুধু সরষে ফুল. ক্ষেতভর্তি কড়াইশুটি
সবুজ ওড়নার ধান
আর মাঠ জুড়ানো মনের কচি পাতা।
মাঠটাকে নিলে কি থাকে আমার।"
পর পৃষ্ঠায় শেষ চারটি লাইন ছিল...
'অবশ্য আমাদের চাইতে নেই
সব চাওয়া তোমাদের ঝুলিতে
তোমাদের প্রেম আকাশ থেকে পা রাখুক মাটিতে,
আমি না হয় চললাম মাটি থেকে সুদূর আকাশে।'

বন্ধু কেন ডাকলে আমায়?

আমি তো বসেই ছিলাম সর্বনাশের পথ চেয়ে
মরা চাঁদের মতো সুযোগ ছিল
নষ্ট মেঘের মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার—
কেন ফেরালে আমার?

সারা রাত জুড়ে ধোঁয়া আর জলের নেশায়
বেহুশ ছিলাম আদিম কামনায়
শ্বাপদ জন্তুর করতালিতে আমি যোগ দিয়েছিলাম
কেন জাগালে আমার?

শ্যাওলা-ধরা মনটাকে কেন সাজালে
তোমার বাসন্তী রঙে
স্বপ্নের সঙ্গীতে মন মাতিয়ে
কেন দূরে পালালে?

আমি তো বসেই ছিলাম ঝড়ের মধ্যে ভাঙতে
তুমি সামনে এসে
ঝড় নিয়ে কেন নীরবে পালালে?
সে কি শুধু তোমার খেয়ালে?

মনের মধ্যে মেঘ

১

মনের মধ্যে মেঘ করেছে
বৃষ্টি নামল বলে
আঁখি-পদ্ম ভাসতে থাকে
দীঘির জলে নেমে।

২

আমার মন পালাল
তোমার মনে আরাম পাওয়ার আশে
আমার হিম কাটল
তোমার গানে কণ্ঠ মেলানোর ফাঁকে।

৩

চুরি হয়ে গেল দেখি
আকাশের রঙ্‌টা
কালো চুলে গোমড়া মুখে
সারাদিনটা মেঘলা।

এক মুঠো স্বপ্ন

১

ব্যস্ত ছেলে দৌড়ে বেড়ায়
ফালুক ফুলুক চেয়ে
বালির বুকে সোনা রোদে
মুক্ত-মেয়ে হাসে।

২

আকাশ জুড়ে গান উড়েছে
দুষ্টু মেয়ের বিয়ে
পড়শীরা সব বেশ মজেছে
ছাতা মাথায় দিয়ে।

৩

মিষ্টি মেয়ে ঘুমের ঘোরে
মুচকি মুখে হাসে
হাতের নীচে স্বপ্ন চেপে
দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে।

৪

বালিশ বুকে চুপটি করে
ভেবে ভেবে গেল বেলা
সন্ধ্যাবেলা তাকিয়ে দেখে
মনের মানুষ সামনে খাড়া।

স্বপ্ন আমাকে ছুঁয়ে যায়

১

সরস চোখে
উপচে পড়া পুলক মনে
খেজুর গাছটা সটান দাঁড়ায়
আলের সীমা ধরে
তেলহীন তার উড়ো চুলে
দুটি শালিক
ভাবতে থাকে
ঘর বাধা যায় কেমন করে।

২

স্বপ্ন কিনবে বলে
খালি ব্যাগটি হাতে
পূজা নামের মেয়েটি
আজও নামে
গুমা থেকে হৃদয়পুরে।

৩

কচি পাতাঘেরা
নতুন ফুলের নরম বুকে
মধু পাবে বলে
দৌড়েছিল দুষ্টু অলি—
স্বপ্ন ছিল
তারও দুরুদুরু বুকে।

মনে পড়ে

খুকি তোকে যখন প্রথম দেখেছিলাম
মনে মনে,
কথা হয়েছিল
সবুজ ঘাসের শিশির ছুঁয়ে
বড় অনুরাগে।

স্কুলে এক ছাতার তলাতে
ভিজতে ভিজতে
সাপের শঙ্খ লাগার মধ্যে
রুমাল ছুঁড়েছিলাম,
আকাশ-কুসুম স্বপ্নে
সুগভীর অঙ্গীকারে।

মেহগিনি গাছের নীচেতে
সোনা রোদ্দুর বুকেতে
তোর কথামত
দাঁড়িয়েছিলাম
শেষ গোধূলির অপেক্ষাতে।

খুকি সেই ছোট্ট থেকে
তোর হাতে শেখানো সেই
অঙ্কগুলো মিলিয়েও
জীবন অঙ্ক মেলাতে না পারার ব্যর্থতাতে
মুখ ঢেকেছি অজান্তিক গোপন যন্ত্রণাতে।

তোর শান্ত মধুর করুণ প্রেমে
চাঁদ ভাসানোর সাধনাতে
দৌড়েছি—ভাবের অনু-পরমাণুর মধ্যেও।
চাঁদ ডুবেছে অমাবস্যার সুব্যাপ্ত আঁধারে—
নিষ্করুণ ব্যর্থতায়,
দু'জন দু'জনের ফ্যাকাশে চোখে
নির্নিমেষ তাকিয়ে রিক্ত মনের পানে।

জীবনের প্রতিটি বসন্ত রাত
কর্মে ঘর্মে ক্লান্তিতে কাটিয়ে
অবশেষে প্রতীক্ষিত প্রেমের বাদলা বৃষ্টির শেষে
এসে পেয়েছিস
একমুঠো দুঃস্বপ্ন।

তবু কিছু বলিস নি
পাছে আমার চোখে তুই স্বার্থপর হোস
সেই ভয়ে।
কিন্তু শেষে! আমাকে মুক্ত দিয়ে যে
মুক্তি নিয়েছিস নিজে।

হয়তো এভাবে
কত মরু মরুদ্যান উপহার দিয়ে
পাষাণী অহল্যার মতো নীরব থাকে
নীরব আকাশ পানে চেয়ে।

পরিবার থেকে পিছিয়ে

তোরা বোন বলে
        বেঁচেছিস অতি সস্তা দরে।
এখন লোক দেখানো বোন বলে
        লজ্জা দিস কেন তবে
আমি যে এখন শুধু এক নষ্ট মেয়ে।

তোরা ভালো থাক সোহাগে
        অর্থে—নামে—আড়ম্বরে
পারলে তোদের মেয়েটা মানুষ করিস
        দিস না সস্তায় বেচে।

মন চোর ও এক আকাশ ধনরত্ন

সব নিয়ে পালিয়ে গেছে
    গত রাতের চোরটা
চিঠি দিয়েছিল করবে চুরি
    ধন-রত্ন সবখানি।
জেগে ছিলাম বন্ধ কপাট।
    ঘুমের ফাঁকে স্বপ্ন বুকে
সিঁদ কাটল সেই মন-চোরটা।

দায়িত্বহীন মহামানব

একবিংশের এক পঙ্গু মানুষ আমি,
জন্ম থেকেই অকেজো আমার বিবেক,
জড়ত্ব আমার রক্ষাকবচ।

আমার দূরদৃষ্টিহীন আবছা দৃষ্টি
আলো-আঁধারের পার্থক্য বোঝে ‾ ।
কর্ণগহ্বরে প্রবেশ করে না অসহায় মানুষের
গগনভেদী করুণ যন্ত্রণা।

মস্তিষ্কের নার্ভ সিস্টেম এতটাই ভণ্ডামীর ধাক্কায় ছিন্ন যে
সঠিক অঙ্কের উত্তরগুলিকে ইশারায় দেখে
ভুল প্রমাণ করে।
আমার পৌরুষ্যত্ব শুধু পত্নীর শোওয়ার ঘরে!
বাকি সময় ভয়ে নুব্‌ঝ।

অপরের প্রার্থনা শুনেও শুনি না
তাতে কর্তব্যগাছের বড় ডাল মাথায় ভেঙে পড়ার
দারুণ সম্ভাবনা থাকে।
আমি তাই শুধু নিজের পরিবারের কাজে মুখর
অন্যথায় মূক।

পৌরুষ্যত্বহীনতায় আমি আনন্দ খুঁজি
কেননা আমি অক্ষমতা স্বীকার করলে
কারও কাছে আমায় জবাবদিহি করতে হয় না।
দায় নিতে হয় না সমাজে কারও।
আমি দায়িত্বহীন ফ্রিহ্যাণ্ডের মহামানব।

মাটি লেপা ঘর ও পল্লী জননী

সূর্যমুখীর প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া সকালের সূর্য
নক্ষত্রের পরিবার থেকে চুরি করে
পালিয়ে সেই কোন্ ভোরে দাঁড়ায়
কৃষকের নিস্তব্ধ বাগান ভর্তি ক্ষেতে।

পুকুরের শান্ত জলে ততক্ষণে
সকাল সকাল জেগে ওঠা
মাছেদের গালগপ্প দৌড় ঝাঁপ--
পেয়ারার ডালে চঞ্চুতে চঞ্চু মিলিয়ে
হলুদ রঙের দুই পাখি দম্পতির সে কি যে আহ্লাদ!

নীল সাদা ওড়না গায়ে মেঘ বালিকা ততক্ষণ
এলোচুলে হাসতে হাসতে পুব থেকে পশ্চিম পাড়ায়
জল আনতে যায়।

ডোবের আস্তাকুঁড় থেকে মুক্তি পাওয়া
ছাইরঙা হাঁসগুলি
চই চই ডাকে গলা ফাটিয়ে নামে পুকুরে—
তারপর তারা একসঙ্গে
খেলে-হাসে-দোলে।

আমার দমবন্ধ কর্মব্যস্ত ফাঁকের মধ্যে
ঘুঘুর ডাক, অভিমানী কুয়াশা
ভেজা জ্যোৎস্না, শ্যামলী মাঠের প্রসারী
সবুজের বাহার, অভিমানী বিকাল
স্বপ্নে ডাকে।

শহরের কাকগুলো শুধু চাই চাই
বাহনা ধরলে পালিয়ে আসি—
পিতৃপুরুষের ছোট্ট মাটিলেপা এ বাড়িতে।
আর তখন পল্লী জননী সযতনে

বসন্ত বাতাসে মুখ ধুয়ে
হাতে দেয় তুলে
দীঘি ভর্তি পদ্ম, গাছ ভর্তি ফল
আর মাঠ জোড়া প্রাণ।

পূর্ণিমা থেকে ঢের পিছিয়ে

প্রতি পূর্ণিমা দেয় উপহার—
অমাবস্যার শূন্যতা।
আমি অমাবস্যার নিষ্কালো মেঘ-বালিকা,
তোরা আমায় ছেড়ে দে না।

অন্ধকারে মুখ ধুয়ে আলো গিয়েছি ভুলে,
আমার দেখাস নে আলোর লোভ
অমৃত ছল করে।

ছদ্ম-ভণ্ডদের দেখে যে আমার
দৃষ্টি গিয়েছে হারিয়ে—
তোরা যার নামে জয়ধ্বনি দিস
সবথেকে সে নষ্ট যে।

আঁধারে মাণিক

জনারণ্যে আমি একা।
তিক্ত অনুভূতি। বিস্বাদ জীবন।
অনেক 'না' এর জমাট পাথরের মধ্যেও
কোন সম্মতি সবুজ মাথা দুলিয়ে বলে না-
'আমি তোমার পাশে আছি'।

রাজনৈতিক নেতার দলে জনতা—
শিল্পীর সামনে শ্রোতা,
মদ্যপের পাশে দয়ালু সহানুভূতি,
এমনকি খুনীর পাশেও
দরদী উকিল।
শুধু আমি একা।
কোন প্রাণ—
এক পশলা বাতাস বুকে,
আমায় বলে না,
থাক না অনেক 'না'—
আমি তোমার পাশে একা।

মন খারাপ মেয়ের প্রতি

ঘুমিয়ে পড় না।
সূর্য জেগেছে—এই দেখ।
এখন নষ্ট-চাঁদের যন্ত্রণা ভুলে
রোদ-ভেজা তোয়ালে দিয়ে
মনটা মুছে নাও।

হাসতে শেখ।
কষ্ট হলেও দাঁড়াতে চেষ্টা কর—
গাছের মমতায়,
পাহাড়ের দার্ঢ্যতায়,
ঝরণার উচ্ছলতায়।

কান্না আমাদের নয়—
আমাদের এমন কি আছে
যে ভেসে গেছে।
কান্না তো তাদের কবচকুণ্ডল
যাবা অনেক কিছু পেতে চায়।
আমরা চাই শুধু মনটা।

তুমি আমি তো স্বপ্ন নিয়ে বাঁচি
তাই আমরা অনেক 'না' এর মধ্যেও
আঁকতে পারি
গাইতে পারি
বাজাতে পারি।

শোনো,
ওদের অবহেলায় কষ্ট পেও না
নুইয়ে যেও না লজ্জাবতী মেয়ের মতো।
ঘুমিয়ে থেকো না এই অবেলায়
অর্ধচেতন বা অচেতন হয়ে।

চল এ দিনটা কাটাই—
পাখির সঙ্গে,
তারার সঙ্গে,
আর বকাটে বৃষ্টির সঙ্গে।

আলো জ্বালাও

১

মনটাকে অন্ধকার রেখো না।
আলো জ্বালাও
আকাশ যেমন সাঁঝবেলাতেও আলো জ্বালে
বসুন্ধরা সন্ধ্যাপ্রদীপ হাতে দাঁড়ায়
তুলসী মঞ্চের নীচে
তেমন।

২

একটু বোসো পাশে।
গান শুনব,
সেই গান—
যে গানের সুরে পশু শিকার-বৃত্তি ভোলে,
নদী পথ চলে উজানে,
লাস্যময়ী ঝর্ণা নৃত্য করে আনমনে,
আর
হাড় উঁকি দেওয়া দুর্বলা
হাত মুঠো করে বলে ;
আর নয়—
এবার সবলা হতে দাও।

জীবনের গান

যে জীবন জৈব প্রবৃত্তির আনন্দে
থেমে থাকে
এবং
অনন্তের স্বাদ থেকে বঞ্চিত মানুষ যেখানে
তাস, জুয়া, লটারী
আর
দেশী মদের মধ্যে
খোঁজে তার নান্দনিক বোধ—
সে জীবন আমায় দিও না।

এক ছটাক জমির জন্যে
ভায়ের গলায় ছুরি!
একটি গোলাপের রঙে
দুটি তরুণের প্রাণহানি
অনেক দেখেছি।
এবার
ওহে শিল্পী, তোমার নিখিল ভুবনব্যাপী
অনিঃশেষ কর্মের মধ্যে
আমার জায়গা দাও।

যে মহাজীবন বস্তির অন্ধকারের
গোপন ঘরেও
প্রাণের হিল্লোল জাগায়
সে-ই আমার প্রার্থিত।
শিশুর হাসি, ফুলের সুবাস
জীবনের চরৈবেতি
আর সবুজ সতেজ ভবিষ্যতি দৃষ্টি
যৌতুক চাই আমি।
বিনিময়ে তুমি নাও
আমার লক্ষ্যহারা ব্যর্থতা
অবিবেকী মমত্বহীনতা
করুণ যন্ত্রণা
আর পাহাড়ের বুকে ধোঁওয়া ওঠার মতো জমাট হতাশা।

নিশীথ রাত ও ধ্রুবতারা

আজ নিশুতি রাতে
আবার পালিয়ে এলাম
তোমার মনে।
ফিরিয়ে দিও না।
আকাশ ছাড়া সূর্যের কে আছে বল?

আমি তো নিশীথ রাতের মত
চেয়েছিলাম নৈঃশব্দ হয়ে পালাতে
তুমি তো ধ্রুবতারা হয়ে
উত্তাল সাগরের মৃত্যু ঢেউ থেকে
জীবন-তটে নিয়ে এলে।
এখন তবে ছায়াপথে
পথ হারাতে বল কেন?

আমি বেপথু হলে
তুমি যে বৃন্তচ্যুত হবে।
মধুকর ছাড়া মধুর ঠিকানা
কে পারে দিতে?

যৌবনকে সংগুপ্ত রেখে

যৌবনকে অর্জিত তপস্যার গণ্ডী মধ্যে
আকাঙ্ক্ষাহীন শূন্যতার খণ্ডিত মাপে,
রেখেছ বন্দী করে সে কোন্ আত্মনাশী প্রতিজ্ঞার তরে?

হে তাপসী অন্ধকার এ বোরখা খোলো,
একাধিক জ্যোৎস্না পুলকিত সন্ধ্যা
দিয়ো না ফিরিয়ে রিক্ত বেদনার শূন্যতা-মাঝে।

আমি তোমারি প্রতীক্ষায় এখনও—
বসন্ত রাতে স্বপ্ন-খোয়ানো মনে লাল-টিয়া ঠোঁটের বকুল গাছের দিকে
নির্নিমেষ চেয়ে শূন্য মন্দিরে আছি বসে।

ওহে মরমিয়া তপস্যার দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত করে
যখন মন ফেরালে আমার মনে,
হয়তো দেখলে আমি ঘুমিয়ে আছি না জাগা ঘুমে।

যৌবনকে সংগুপ্ত রেখে,
অফুরান জীবনের পুষ্পিত গন্ধে মুখ ফিরিয়ে—
আর কতকাল মৌন রাত কাটাবে?

আমার ক্ষমাহীন অপরাধের শাস্তি
নিজে বহন করে এ কোন্ ছিন্ন গোলাপ
তুমি আমায় উপহার দিলে?

সেদিনের স্মৃতি ও এদিনের বিস্ময়

প্রায় মনে হয়,
তুমি কি স্কুলে পড়া একাদশ শ্রেণির সেই
আপদমস্তক লাজুক-লতাটি আছো?

গতদিন বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে
ব্যস্ত পায়ে তোমায় দেখে
হতবাক হয়েছি।

গোবরডাঙ্গার প্রীতিলতার অধরা সেই তুমি
কেমন ধরাধরি গলাগলি করে
হাওয়ার মধ্যে হারিয়ে গেলে।

তবে এখনও এই তুমি সেই তুমি তো
না অন্য কারো মত
চোখের ইঙ্গিতে
কিংবা
হাল্কা রঙের নীলাভ ব্লাউজের মধ্যে দুষ্টু মনের
অশান্ত খেলার নেশায়
কাছে টানো পুরুষ পাখিকে
বৃষ্টি-স্নানের অবিরাম তৃষ্ণা মেটাতে।

সেই সুর ধ্বনিয়া ওঠে কি কণ্ঠে তোমার?
মনে বাজে
শরতের কিংবা বসন্তের
আনমনা স্মৃতি
ছন্দে ছন্দে।

কত সাধ নিয়ে লিখেছিলাম
'নব বসন্তে
জেগে থেকো।'
জেগে আছো কি?

না কফিনের মধ্যে নিরবিচ্ছিন্ন ঘুমের মতো
ঘুমিয়ে পড়েছো
লোভ-লালসা-ক্ষুৎপিপাসা ও
যৌনক্ষুধা নিয়ে।

সেদিন দূরগামী ট্রেনে বসে
কত আশার মালা গেঁথেছিলে।
প্রতিশ্রুতির কত চাঁপা, জুঁই, বেলকুঁড়ি
তোমার কথায় গন্ধ বিলিয়েছিল।
মনে আছে সেদিনের কথা?
না লিজা, বর্ণা বা অপর্ণা, করুণাদের মতো
হাজার প্রতিশ্রুতি শুধু কথার বকুল হয়ে
ঝরেছে
পচেছে
শুকিয়েছে।
আজও তাই মনে হয়
অন্য কারও কারও মতো
তুমিও বদলেছো।
লিজা থেকে মধুমিতারা যেমন বদলে যায়
হাওয়া বদলের মতো
তুমিও হয়ত...!

সেকালের বেহুলা ও একালের দেবতা

শ্রেয়ার সঙ্গে দেখা হল,
        একি চেহারা তার!

সেই সকরুণ চাহনি—
            কিছু কথা কিছু যন্ত্রণা
            কষ্ট-আশঙ্কা-ব্যক্ত-অব্যক্ত বেদনা
সব মিলিয়ে এমন বিহ্বল চাহনি।

একালের শ্রেয়া সেকালের বেহুলার মতো—একই সারিতে।
            পার্থক্য এখানে,
সেদিনের বেহুলা সমাজের সংস্কার উপেক্ষা করে,
            প্রায় সারারাত অনিদ্র জেগে,
মেয়েবেলার কত গল্প তুলেছিল জমিয়ে—বাসর-রাতে।

কিন্তু তাদের ভালোবাসার ফুরফুরে বাতাসে
        ভালোবাসা বঞ্চিত পড়শী মনসা প্রতিহিংসার বিষ ছড়ালে—
দুর্বল শরীর লখীন্দর ঢলে পড়ে
                সান্দ্র ঘুমে-জমাট অন্ধকারের মধ্যে।

তারপর কত উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষা ঘিরে রাখে।
            গাঙুরের ছলাৎ ছলাৎ শব্দে
                সংশয়ী দোদুল মন ওঠে কেঁপে ;
তবু কাতর ঘুমে ক্লান্ত চাঁদ দেখতে দেখতে
        মানবী নেতার কথামত চলে,
মর্ত্যলোক থেকে ঢের উঁচুতে চড়াই-উৎরাই ডিঙিয়ে—
        স্বর্গে—প্রলয়ী নৃত্যের আসরে।

চমকিত পুরুষ উপহার দেয় তার নৃত্যে
        মনসার ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে
ব্যর্থ-স্বামী লখীন্দরের শক্ত-সমর্থহীন দেহটাকে।
        এভাবে অনেক পুরুষের কামনা প্রতিহত করে
বেহুলা ফিরিয়ে আনে তার স্বামীকে—-দেবসমাজের কৃতজ্ঞতার বিনিময়ে।

এ যুগের বেহুলা ব্যর্থ হয় ভালোবাসার লখীন্দরকে ফেরাতে।
এখনকার দেবসমাজ বেহুলার মৃত স্বামীকে ছুঁড়ে ফেলে
জোর করে তাকে ধর্ষণ করে।
একালের বিধবা বেহুলাকে ফিরতে হয় স্বামীহারা হয়ে—
তবে লাঞ্ছিত ভ্রূণ তার গর্ভে যৌতুকের উপহারে
কাঁদতে থাকে লজ্জায়, বিস্ময়, দগ্ধ যন্ত্রণাতে।
